মুক্তা চুরি

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন প্রণীত

"তুয়া সনে মান করনু
হাম অতি অলপ গেয়ান।"

বিদ্যাপতি

মূল্য ১৷৵০

প্রকাশক

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র দাস গুপ্ত

গুপ্ত এণ্ড কোং

৪৯, রসারোড ভবানীপুর, কলিকাতা।

কাৰ্ত্তিক প্রেস

২২, স্থকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শ্রীকালাচাঁদ দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

উৎসর্গ

মাননীয়

শ্রীযুক্ত স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

সর্ব্বপ্রধান বিচারপতি মহাশয়ের

সুবিচারার্থ

এই "মুক্তা-চুরি"র মাম্‌লাটি

তাঁহার করকমলে

অর্পণ করিলাম।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

চিত্র-সূচি

অবতরণিকা—শিক্ষিত সম্প্রদায় এক সময় কীর্ত্তন গান অতি হেয় ব'লে মনে কর্‌তেন। এমন কি এ দেশের কোন বিশিষ্ট সমাজ খোলের উপর এতটা বিরক্ত ছিলেন যে তাঁদের প্রার্থনা-মন্দিরের আঙ্গিনায় কেউ খোল আন্‌তে পারবেন না, দলিলপত্রে এইরূপ একটা সর্ত্ত লিখে রেজেষ্টারী করেছিলেন।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় কুষ্ঠিয়া-নিবাসী শিবু কীর্ত্তনিয়ার কীর্ত্তন গান শুনে তার বিশেষ

পক্ষপাতী হয়ে পড়েন। শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের মধ্যে ইনিই সর্ব্বপ্রথম কীর্ত্তনের অনুরাগী হ'য়ে এ বিষয়ে বিশিষ্ট সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

প্রায় ১৪ বৎসর অতীত হোল শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্রের মৃত্যু হয়; রূপে গুণে এই তরুণ যুবক ঠাকুর-পবিবারের প্রদীপ স্বরূপ ছিলেন। এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় গগনবাবু অত্যন্ত শোকাতুর হয়ে পড়েন। শোক-সন্তপ্ত পরিবারের সান্ত্বনার জন্য আমি স্বর্গীয় ক্ষেত্রনাথ চূড়ামণি কথক মহাশয়কে আহ্বান কোরে নিয়ে আসি। তাঁর কথকতায় গগনবাবু এবং তাঁর বাড়ীর অপরাপর সকলে অনেকটা সান্ত্বনা লাভ করেছিলেন। ক্ষেত্র চূড়ামণি প্রায় তিনমাসকাল যোড়াসাঁকোতে কথকতা করার পরে সেই আসরে শিবুকীর্ত্তনীয়া এসে কীর্ত্তন সুরু করে দিয়াছিল; রবিবাবু স্বয়ং তাকে আনিয়েছিলেন।

শিবুর শরীরটি একটু স্থূল ছিল,—ভক্তির আবেশে সেই দেহটি যে কতরকম হাবভাবে হেলে দুলে আসর জমকিয়ে তুল্‌তো এবং গানের একার্দ্ধ গেয়ে অপরার্দ্ধ হাতের ভঙ্গীর দ্বারা সে যে কি অদ্ভুত রূপে বুঝিয়ে দিত,—তা' যাঁরা তার গান না শুনেছেন, তাঁরা ধারণাই কর্‌তে পার্‌বেন না। গগনবাবু তার এই হাবভাবের অনেকগুলি ছবি এঁকেছিলেন, সেগুলি দেখ্‌লে এখনও শিবুর কীর্ত্তনের সুরটা আমার কাণে বাজ্‌তে থাকে।

শিবুর গানে সমস্ত ঠাকুর-পরিবার মুগ্ধ হোয়েছিলেন। বৃদ্ধ দ্বিজেন্দ্রনাথ থেকে সুরু কোরে আমি প্রায় সবাইকে শিবুর গান শুনে কাঁদ্‌তে দেখেছি। সেই আসরে বহু লোক সমবেত হোতেন। এইভাবে রবীন্দ্রবাবুর কৃপায় অনেকদিন পরে বঙ্গদেশে ভদ্রঘরে কীর্ত্তনের জয়ডঙ্কা আবার বেজে উঠেছিল।

* অবতরণিকা *

ঠাকুরদের বাড়ীতে এ-যাবৎ অনেকবার দীপ জ্বলে উঠেছে—সেই আলো থেকে সমস্ত দেশময় দীপালী হোয়েছে। তাঁরা কিন্তু অনেক সময় দেশে এক-একটা নূতন আলো জ্বেলে দিয়ে—নিজের ঘরের দীপটা নিবিয়ে ফেলেছেন। এঁরা কেবলই নূতন কিছু চান। যেটা প্রথম আনেন, সেটা দুদিন বাদে ঘর থেকে বার কোরে দিয়ে আবার আর একটা কিছুর জন্য লালায়িত হন। কীর্ত্তনে এঁরা মেতে উঠেছিলেন কিন্তু সে সখ্ এঁদের মিটে গেছে,—এখন বাউলের পালা এসেছে।

যোড়াসাঁকোর আসরে কীর্ত্তনের বাতি নিবে গেল,—ভবানীপুরে শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয়ের বাড়ীতে তা' জ্বলে উঠ্‌লো। এখন শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের দৃষ্টি এদিকে পড়েছে—কলিকাতার ভাল কীর্ত্তনীয়ারা আবার ভদ্রঘরে স্থান পাচ্ছে।

আমি শিশুকাল থেকে অনেক কীর্ত্তনীয়ার গান

শুনেছি। ধূলট উপলক্ষে নবদ্বীপে গিয়ে বঙ্গের কীর্ত্তনীয়াদের মধ্যে যাঁরা চূড়া, তাঁদের রস-নির্ঝরের বিন্দু আস্বাদন কোরে এসেছি। স্বনামধন্য গণেশ এখনকার মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তনীয়া, কিন্তু যাঁরা নবদ্বীপ বঙ্গ-পাড়া নিবাসী গৌরদাসের পূর্ব্ব-গোষ্ঠ শোনেন নাই, তাঁরা বঙ্গের প্রাচীন সম্পদের একটা খুব দামী জিনিষ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ রয়েছেন—একথাটা বোধ হয় জোর ক'রে বলা যেতে পারে।

এ দেশের কয়েকটি গৌরব সম্বন্ধে একজন লেখক ইতিপূর্ব্বে একটা সন্দর্ভ লিখেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, আমাদের দেশের প্রথম গৌরব হচ্ছে হাতী,—এ শুনে আমরা হাসি সংবরণ করতে পারিনি। কিন্তু আমার মতে এদেশের গৌরব করার মতন চারটি জিনিস আছে। প্রথম ঢাকার মস্‌লিন্—এই গ্রীষ্ম-প্রধান দেশের প্রখর সৌর-করণে দগ্ধ হোয়ে আমরা সার্জ্জ পরে ঘামতে থাকি,

অথচ মস্‌লিন্ ছেড়ে ব'সে আছি। শীত-প্রধান দেশের রুচি আমাদের আশ্চর্য্যরকম পেয়ে বসেছে। বঙ্গের দ্বিতীয় গৌরব নব্য ন্যায়। এটা ভারি শক্ত জিনিষ, সাহেবেরা এপর্য্যন্ত এই জিনিষটার আস্বাদন কর্‌তে পারেননি। তাঁরা যতক্ষণ না বোলে দিচ্চেন, ততক্ষণ আমরা এই বিষয়টা নিয়ে গৌবব কর্‌তে সাহস পাব না। তৃতীয় গৌরব, ফজলী আম। কেউ না বলা সত্বেও এটা যে কেন আমাদের রসনায় মিষ্ট লাগে—তা' খুব আশ্চর্য্য!

মনোহরসাই কীর্ত্তন হচ্ছে বাঙ্গলার চতুর্থ এবং সর্ব্বপ্রধান গৌরব।

আমরা একসময় আমাদের মন্দির থেকে এই জিনিষটা ঝেঁটিয়ে দূর কর্‌তে চেষ্টা পেয়েছিলেম, তা' পূর্ব্বেই লিখেছি। কিন্তু খোল আবার ঘরে ঘরে বেজে উঠেছে। প্রায় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে কদলী পত্তন নগরে গোরক্ষনাথ এই খোল বাজিয়ে,

তার গুরুগম্ভীর আওয়াজে "কায়া সাধ" উপদেশটি ধ্বনিত কোরে গুরু মীননাথকে প্রবুদ্ধ করেছিলেন। নদে শান্তিপুরে গঙ্গার ধারে এই খোলের এমনই মধুর ধ্বনি উঠেছিল, যে সাড়ে চারশত বৎসর পরে সেই ধ্বনির প্রতিধ্বনি বাঙ্গলার হাটে, মাঠে, পল্লীতে পল্লীতে এখনও শোনা যাচ্ছে। "রাই-কানু" ভিন্ন গান হয় না"—এখনও এদেশের লক্ষ লক্ষ লোকের ধারণা। বহু যুগের এই সংস্কারটি এখনও লোক-চিত্তে ভক্তি-প্রেমের একটা প্রবল প্রেরণা দিচ্ছে। দেশে আপামর সাধারণের হৃদয়-নিভৃতে যে এত বড় একটা শক্তি রয়েছে, তা' উড়িয়ে দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ ব'লে মনে করতে পারি না। মুষ্টিমেয় প্রজ্ঞাভিমানী ব্যক্তি যদি এক বৃহৎ দেশ-ব্যাপী সংস্কারকে অবজ্ঞা না কোরে—তার মাঝ থেকে এই কালের উপযোগী কোরে রসের উৎস মুক্ত করে দেন, তবে সমস্ত দেশের লোক সে

রস আস্বাদন কর্‌তে পার্‌বে। আসমানের উপর অট্টালিকা গড়া চলে না; যে দেশে বাস—সে ভূমিকে অবজ্ঞা কোরে কোন্ কীর্ত্তিমান্ কবে যশের অমর মন্দির তুল্‌তে পেরেছেন?

মুক্তা চুরির মত পাঁচখানি বই আমি লিখেছি! যে দেশে চিরকাল শুনে এসেছি "রাই-কানু" হচ্ছেন গানের একমাত্র বিষয়, সে দেশের জনকয়েক লোক যদি জিজ্ঞাসা করেন, আমি এ বিষয় নিয়ে বই লিখ্‌ছি কেন, তার কৈফিয়ৎ দিতে আমি সম্মত নই। আমি উত্তরে বল্‌ব—"আপনাদের এ প্রশ্ন খাঁটি বাঙ্গালী কেউ সহ্য কর্‌বেন না।"

কীর্ত্তনের পদাবলী থেকে সংগ্রহ করা ভাবগুলি নিয়ে আমি যে বইগুলি লিখেছি, তাদের সম্বন্ধে মৌলিকতার দাবী আমি করি না। মুক্তা নিয়ে অনেক ঝগড়ার কথা এই পুস্তকে লিখিত হয়েছে, কিন্তু অন্য হিসাবেও এই বইএর 'মুক্তা চুরি' নাম

সার্থক। 'মহাজন'গণের ভাণ্ডারে যে সকল মুক্তা পেয়েছি, তাদের কবিত্বের স্বর্ণ-কৌটা ভেঙ্গে আমি সেগুলি অপহরণ করেছি। সুতরাং মুক্তা চুরি নাম সার্থক হোয়েছে। এই পুস্তকের অনেকাংশই সাবেকী পদ-ভাঙ্গা; দৃষ্টান্ত-স্থলে কয়েকটি স্থান নির্দ্দেশ ক'রে যাচ্ছি। ৭ম পৃষ্ঠায় ১—১৪ ছত্র ভাগবতের নানা পদ হোতে আহৃত। ৫৭।৫৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত স্বপ্নটি চণ্ডীদাসের "রজনী শাঙন ঘন ঘন দেওয়া গরজন" প্রভৃতি পদের অনুবৃত্তি। এই পদটি জ্ঞানদাস কতকটা রূপান্তরিত কোরে তাঁর নামে চালিয়েছিলেন। ৬২ পৃষ্ঠার ভাবটি শশী-শেখরের "জিত কুঞ্জর, গতি মন্থর, চলল বরনারী" এবং তৎপরবর্ত্তী অংশও সেই কবির পদ থেকে নেওয়া হোয়েছে। ৬০ পৃষ্ঠার ৬-৯ ছত্র কৃষ্ণ-কমলের রাই-উন্মাদিনীর "যখন—তারে মন্দ কবে, চন্দ্রমুখ মলিন হবে—এই ভেবে ফাটে মোর বুক"

প্রভৃতি পদের অনুকরণ। ৭৫ পৃষ্ঠার ১১-১৬ ছত্র রাই উন্মাদিনীর "কুঞ্জের দ্বারে কে ঐ দাঁড়িয়ে" প্রভৃতি পদের প্রতিচ্ছায়া। এই বই পড়ে যাঁদের প্রাচীন পদ পড়্‌বার কৌতূহল হবে, তাঁদের জন্যে পদগুলির নির্দ্দেশ করে দিচ্ছি।

এই গল্পের আখ্যান-বস্তুটি 'মুক্তালতাবলী' নামক একখানি প্রাচীন কৃষ্ণলীলার বই হোতে সংগ্রহ করা হোয়েছে।

আমি প্রাচীন মাল মস্‌লা নিয়ে গড়েছি সত্য, কিন্তু সব জায়গায়ই প্রাচীন ভাবগুলিকে নূতন আকার দিতে চেষ্টা করেছি। আমার মনে হয়েছে, এই কাজে যেন আমি কতকটা সফলতা লাভ কোরেছি। গল্পগুলির কয়েকটি আমি কলিকাতার কোন কোন সভা-সমিতিতে পড়েছি; এবং কলিকাতার বাইরে গরলগাছা গ্রামে গিয়ে—সেখানকার সাহিত্য-সভার অনুরোধে আমায় একটা

পড়্‌তে হ'য়েছিল। এ ছাড়া বহু নব্য-শিক্ষিত ও প্রাচীন লোক এই গল্পগুলি বেহালায় এসে শুনে গেছেন—তাঁদের অনেকেরই ধারণা এই গল্পগুলি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট আমাদের প্রাচীন ভাবের একটা পরিচয় দিতে পার্‌বে। সে যা হবার হবে, তার বিচারক আমি নই। আমি যে জিনিষ নিয়ে জীবন ভ'রে আনন্দ পেয়ে এসেছি—এগুলি সেই কথা—আমার কাছে এর মতন মধুর ও সুখদায়ক বিষয় আর কিছু নেই। রসের আস্বাদন যে করে, সে সব সময়ে তা' অপরকে ক'য়ে বোঝাতে পারে না।

সম্প্রতি বাঙ্গলাদেশের কীর্ত্তনকে সংগীতশাস্ত্রে বিশিষ্ট একটা স্থান দিয়ে নূতন রূপে প্রতিষ্ঠিত কর্‌বার একটা চেষ্টা হচ্ছে। এমন কি সংগীত প্রভৃতি কোমল কলা-শাস্ত্রকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত কর্‌বার কথা উঠেছে। কীর্ত্তনীয়াদিগকে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে

আহ্বান কোরে বাৎসরিক পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা করবারও প্রস্তাব হোয়েছে। কয়েকমাস পূর্ব্বে মাননীয় শ্রীযুক্ত স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের উদ্যোগে তাঁর বাড়ীতে এই সম্বন্ধে একটি ক্ষুদ্র সভা আহুত হয়েছিল। সেই সভায় শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ, প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতি কয়েকজন উপস্থিত হোয়ে প্রসঙ্গটির আলোচনা করেছিলেন। শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয় ব্যয়ভারের অনেকটা অংশ গ্রহণ করতে প্রস্তুত হয়েছিলেন। নানারূপ অনিবার্য্য কারণে এই সভার কার্য্য আর অগ্রসর হোতে পারেনি। কিন্তু স্যার আশুতোষ স্বতঃপ্রবৃত্ত হোয়ে যে কার্য্যে হাত দিয়েছেন—তা' কোন্ না কোনদিন সফল হবে,

এটি আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। তিনি তাঁর বিরাট্ কর্ত্তব্যগুলির মধ্যে—মনোহরসাঁই কীর্ত্তনের কথাটি ভুলে যাননি—এই সহৃদয়তায় মুগ্ধ হোয়ে, আমি মূলতঃ কীর্ত্তন গান অবলম্বন কোরে যে কয়েকখানি বই লিখেছি, তার প্রথমখানি তাঁর নামে উৎসর্গ কর্‌লুম।

এই ক্ষুদ্র পুস্তকগুলির মধ্যে যে চরিত্রগুলির প্রসঙ্গ লেখা হোয়েছে, ২০।২৫ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালী হিন্দুমাত্রেই তাঁদের কথা জান্‌তেন। কিন্তু আজ কাল ঘরের কথা আমরা যেরূপ দ্রুতভাবে ভুলে যেতে চলেছি, তাতে চরিত্রগুলির কিছু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক বোধ হচ্ছে।

এই পুস্তকে কৃষ্ণের সাতটি সখার নাম উল্লেখ করেছি, যথা—বসুদাম, সুদাম, শ্রীদাম, অংশুমান, মধুকণ্ঠ, মন্দার ও মধুমঙ্গল। প্রথমোক্ত তিনটি সম্বন্ধে রাধাতন্ত্রে লিখিত আছে:—"অথ প্রিয়সখা

দামসুদামবসুদামকাঃ। শ্রীদামাদ্যাঃ সদা যত্র শ্রীদামানন্দবর্দ্ধকাঃ॥ (২০ পটল, ১৬।১৭) এবং মধুকণ্ঠ সম্বন্ধে “......মধুকণ্ঠোমধুব্রতঃ। তদ্বেণুশৃঙ্গমুরলী যষ্ঠিপাশাদিধারিণঃ।” (২০ পটল ২২ শ্লোক) এবং মন্দারের কথাও ২০ পটলে উল্লিখিত হয়েছে। অংশুমান সম্বন্ধে অনেক স্থলেই উল্লেখ আছে—যথা মহাজন-পদে—“আওত শ্রীদামচন্দ্র রঙ্গিয়া পাগড়ী মাথে। স্তোক অর্জ্জন অংশুমান দাম সুদাম সাথে।” মধুমঙ্গল সখাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ ছিলেন। এজন্য দেখা যায় গোপীদের ব্রাহ্মণ-ভোজন করাবার দরকার হোলেই কৃষ্ণ-সখা মধুমঙ্গলের ডাক পড়্‌তো, যথা চণ্ডীদাসের পদে রাধার উক্তি—“তোরা শ্রীমধুমঙ্গলে, ডাকহ সকলে, ভুঞ্জাও পায়স দধি।” রাধিকার সখীদের মধ্যে এই আটজনের নাম উল্লেখ করেছি—ললিতা, বিশাখা, চিত্রা, চম্পকলতা, সুদেবী, ইন্দুরেখা, রঙ্গদেবী ও সুদেবী। রাধাতন্ত্রের

* অবতরণিকা *

১৭ পটলে লিখিত আছে রাধাকৃষ্ণের মিলনকালে ললিতা সম্মুখভাগে ও বিশাখা পূর্ব্বদিকে দাঁড়াতেন। অপর ছয়জনের নাম গোবিন্দদাসের একটি পদে বড় সুন্দরভাবে উল্লিখিত আছে—(বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়, ২য় ভাগ ১০৩২ পৃষ্ঠা)।

পরিশেষে কৃতজ্ঞতার সহিত জানাচ্ছি, আমার প্রিয়সুহৃৎ ভারতী সম্পাদক শ্রীযুক্ত মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় বিশেষ যত্নপূর্ব্বক এই পুস্তকের প্রুফ সংশোধন ক'রে দিয়েছেন এবং ভবানীপুরের গুপ্ত এবং কোং বহু ব্যয় কোরে আমার কৃষ্ণলীলার পাঁচখানি বইএর প্রকাশ-ভার গ্রহণ করেছেন।

বেহালা, ২৪ পরগণা,
১২ই চৈত্র, ১৩২৬ বাং

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

উঠ্‌লে—"কিরে তুই যে কিছু বলছিস্‌নে ভাই? তোর ইচ্ছা না হলে ত হবে না, আমাদের যা কিছু আব্‌দার সে তোরই কাছে।"

কৃষ্ণ বল্লেন, "একটা মুক্তো যদি আন্‌তে পারিস, তবে আমি মুক্তোর বন করে ফেল্‌ব। কিন্তু একটা কিছু না হলে তো আমি আর অমনি অমনিই গড়্‌তে পারব না।"

২

তখন রাখালেরা এ ওর মুখপানে চাওয়া চাওয়ি কর্‌তে লাগ্‌ল—সেই একটা মুক্তোই বা কোথায় পাওয়া যায়? বসুদাম বল্লে, "আমার মায়ের দুটো আছে, তা' দিয়ে কানের দুল্‌ করেছে। একদিন তাতে হাত দিয়েছিলুম, মা বল্লে, ও কচ্ছিস্‌ কি? ওর বড্ড দাম—ওতে হাত দিতে নেই। কথা শুনে আমার বড্ড ভয় হোল। ভাই,

* মুক্তো চুরি *

আমরা রাখাল, দামী জিনিস আমাদের ছুঁতে নেই। আমরা ছুঁতেও চাই না; কৃষ্ণের গা ছুঁলেই, ভাই, আমার আর কিছুর লোভ থাকে না। সেই মায়ের মুখে শুনেছিলুম, মুক্তো দামী জিনিস, তাই সে কথা বল্ছি, তা না হলে আমি দামের খবর কি রাখি?" একজন রাখাল একটা কদমগাছের ডাল এক হাতে ধ'রে দাঁড়িয়েছিল; সে বসুদামকে বল্লে—"তা তুই তোর মায়ের দুল্ থেকে একটা মুক্তো চেয়ে নিয়ে আয় না!" বসুদাম বল্লে, "সেদিন একটুখানি ছুঁয়েছিলুম, তাই মা দামী জিনিস বলে তুলে রাখ্লে। ভাই বড্ড ঘেন্না হোয়েছে, দামী জিনিসের উপর বড্ড ঘেন্না হোয়ে গেছে। এখন চাইতে গেলে মা যদি গাল মন্দ দেয়,—সে আমার সইবে না। হাঁরে কৃষ্ণ, মুক্তো কি খুব দামী জিনিস নাকি রে? দামী জিনিস হোলে ও দিয়ে কি হবে? ধর্তে গেলে ছুঁতে গেলে, মা পর্য্যন্ত যার উপর

ছেলের থেকে বেশী মায়া দেখায়, সে জিনিস দেখে আমার ভাই বড্ড ভয় করে।"

৩

কৃষ্ণও বল্লেন—"ওরে দামী টামী কিছু নয়, আমি হাতে পেলে, ওটাকে আমি একটা মাধবীর বিচির মত বুনে দেব ; ও তোরা অজচ্ছর পাবি।" সুদাম বল্লে—"তাত জানি ভাই। লোকে যা নিয়ে বড়াই করে, তা যে তোর পায়ের কাছে গড়াগড়ি যায়। সেদিন বনে ঐ যে রাজার মত একটা লোক হাতীতে চড়ে এসে তোর পায়ে পড়লো ; তার মুকুটে কত মাণিক জ্বল্‌ছিল, সেই মুকুটটা তোর পায়ের উপর ফেলে কত কি মিনতি কোরে বল্‌তে লাগ্‌ল ; তুই মুকুটটা চাইলে কি সে আর তা দিত না ? অবশ্যই দিত। তুই তো তার দিকে ফিরেও তাকালি না। তোর কি মনে পড়ছে না

ভাই, ঐ যে যার নাম ইন্দ্র না কি বল্লি ?" শ্রীদাম একটু থেমে আবার বল্‌তে লাগ্‌ল—"হ্যাঁরে কৃষ্ণ, রাইএর গায়ে তো অনেক মুক্তো আছে, তুই চাইলে তার কি একটা আর দেয় না ? তুই বলিস্ তো আমি এখুনি তোর নাম কোরে চেয়ে নিয়ে আসি।"

কৃষ্ণ রাইএর কথা শুনে বড় খুসী হোলেন। তাঁর নাম যার মুখে শোনেন, তার দিকে তাকিয়ে থাকেন; সে যে কি বলে তা পর্য্যন্ত ভুলে যান্। সুদাম বল্লে—"কিরে কৃষ্ণ, ওর কথা শুন্‌লে তোর চোখ যে ছল্‌ছল্ কোরে ওঠে; বল্ ভাই, তার কাছে মুক্তো চাইতে যাব কি ?" লজ্জা পেয়ে কৃষ্ণ নিজেকে সাম্‌লে নিয়ে বল্লেন—"হ্যাঁ, যাবে বই কি! আমার নাম কোরে চাইলেই সে দেবে।" রাখালেরা হেসে উঠ্‌ল—"মুক্তো তো তার ভাণ্ডারে অফুরাণ্। সে হচ্ছে রাজার মেয়ে। আমরা গরু-গুলিকে কেমন সাজিয়ে ফেল্‌ব !"

৪

রাখালদের ভারি স্ফূর্ত্তি হোল। কেউ বাছুরের লেজ ধরে দৌড়তে লাগ্‌ল; কেউ একটা ডুরে কম্বল মুড়ি দিয়ে বাঘের মত থাবা পেতে ব'সে গরুকে ভয় দেখাতে লাগ্‌ল; কেউ বেঙ্গের সঙ্গে লাফিয়ে লাফিয়ে ছুট্‌ল; কেউ বা উড়ন্ত পাখীর ছায়ার সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে যেতে লাগ্‌ল; কেউ বা কোকিলের ডাক ডাক্‌তে ডাক্‌তে চল্ল; কেউ দাঁত বার করে বানরগুলোকে ভেঙ্গ্‌চাতে লাগ্‌ল; কয়েকজন মিলে গেড়ু্‌ খেল্‌তে সুরু করে দিল; কেউ শিবঠাকুর সেজে শিঙ্গায় ফুঁ দিলে; কেউ বা বালুর উপর পাখীর পদচিহ্ন ধোরে ধোরে যেতে লাগ্‌ল; কেউ বা চোখ বুজে অন্ধ সেজে হাতড়াতে হাতড়াতে চল্ল; কেউ বা এক-ঠেঙ্গো সেজে লাফাতে লাফাতে চল্ল; কেউ বা সাদা উড়্‌নী

দিয়ে গা ঢেকে যমুনার পারে বকদের মধ্যে গিয়ে বক হোয়ে বসে রইল।

সুদাম রাখালদের নিকট বিদায় হয়ে "হারেরে কানাই" সুর ধরে গাইতে গাইতে বৃষভানু পুরীর দিকে রওনা হোয়ে গেল।

৫

তখন রোদ পড়ে এসেছে। বৃষভানুপুরে রাই সখীদের সঙ্গে সাজ সজ্জা কচ্ছেন। ললিতা সোনার চিরুণী দিয়ে রাধার চুল আঁচড়ে দিচ্ছেন; কালো চুল নদীর মত ঢেউ তুলে নীচে নাব্‌ছে; সেই কালো চুল দেখে রাইএর চোখে জল আসুছে। ললিতা চুলের গোছা ধ'রে সুগন্ধী তেল দিয়ে বিন্যাস কচ্ছেন, রাধা সেই চুলের দিকেই চেয়ে আছেন, আর একটা আঙ্গুল দিয়ে চোখের কোণ হ'তে ফোঁটা ফোঁটা জল মুচ্ছেন। কালো রং দেখে

একটা আঙ্গুল দিয়ে চোখের কোণ হ'তে ফোঁটা ফোঁটা জল মুচ্ছেন

—৮ পৃষ্ঠা।

Emerald Ptg. Works, Calcutta

কৃষ্ণপ্রেমে তার মন ভোরে উঠ্‌ছে। তারপর ললিতা মালতীমালা দিয়ে যেই চুলগুলি ঘিরে ফেল্লেন—তখন রাধার চোখ দুটি সেই কালো রং কাজল-লতায় খুঁজ্‌তে লাগ্‌ল। বিশাখা খোপা বাঁধতে মজবুত, সে সেই একরাশ চুল ললিতার হাত থেকে তুলে নিয়ে বেশ করে বিনোদ খোপাটি বাঁধ্‌লে। চিত্রা সোণার সিঁথিটি নিয়ে হাজির, সিঁথি-মূলে সে'টি পরিয়ে দিলে। চম্পকলতা সিন্দুরের টিপ্‌টি দিলে। রঙ্গদেবী দুল পরাতে লাগ্‌ল; এবং সুদেবী রাইএর আলতা-পরা রক্ত পদ্ম-কলির মত পাদুখানিতে প্রণাম করে গজমতির হারটি তাঁর গলায় পরিয়ে দিলে। ইন্দুরেখা সোণার নূপুর পায়ে পরাচ্ছিল; এমন সময় একটা উড়ন্ত পাখীর মত মিষ্টস্বরে গাইতে গাইতে সুদাম তথায় উপস্থিত হল।

৬

তাকে দেখে রাই যেন একটু চম্‌কে উঠলেন। "এই অসময়ে এখানে এলি যে! তোর দল কোথায়? কোনো খবর আছে?"

"আছে, আমরা গরু সাজাব মুক্তোর মালা দিয়ে। একটি মুক্তো পেলেই কানাই ভাই মুক্তোর বন তৈরী কর্‌বে—তাই তোমার কাছে একটা মুক্তো চাইতে এলুম, ঐ হারের বড় মুক্তোটা দাও না, তা' হোলে আমাদের মুক্তোগুলি বেশ বড় বড় হবে!"

রাই গজমুক্তোর হারের মাঝের সেই মুক্তোটা দেবেন ভেবে তাতে হাত দিলেন। "এ সকল অলঙ্কার তো কৃষ্ণসেবারই জন্য" কিন্তু তাঁর মনে হোল কানাইকে এই ছলে এখানে কি আনা যায় না? কপট রাগ দেখালে ত রাগ ভাঙ্গাবার

"এইটে বুঝি চা'প্।"—১১ পৃষ্ঠা

Emerald Ptg. Works.

পালা আস্‌বে। সেই যে কখনো কাঁদ-কাঁদ হোয়ে, কখনো পায়ে ধোরে সে মিনতি করে, তার মত সুখ ত আমার কিছুতেই হয় না; মনে হয় সারা জন্মটা আমি রেগে বসে থাকি, আর সে সেধে সেধে আমার মান ভাঙ্গায়। আমি একটু চোখ রাঙ্গালেই যে চোখের জলে ভেসে যায়, তাকে দিয়ে আজ মুক্তোটার জন্যে সাধিয়ে নেব—সহজে দিচ্ছি না। রাধার মনে একটু অভিমানের গুমোর হোল; অভিমান, কিন্তু মান নয়। কানাইকে হাতে পেয়েছি তাঁর এই গরব হোল; তিনি মুক্তোটার উপর হাত রেখে সুদামকে বল্লেন—“এইটে বুঝি চাস্‌?” সুদাম সরল মনে বল্লে, “হ্যাঁগো হাঁ, ঐটে দাও না। শ্যামলীকে ওই রকম মুক্তোর মালা চমৎকার মানাবে ভাই।”

৭

রাধা বল্লেন, "তুই রাখাল কিনা, তাই ও রকম বল্‌ছিস্!"

সুদাম কথাটার অর্থ বুঝতে না পেরে অবাক্ হোয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল। রাধা বল্লেন, "যা, যা, বনে সন্ধ্যামালতী ফুল তুলে খেলা কর্‌গে; গুঞ্জামালা গেঁথে গলায় পর্‌গে। কখনও মুক্তো কিনেছিস্ যে তার দর জান্‌বি?"

সন্ধ্যামালতী ও গুঞ্জাফল হোতে যে মুক্তোর দর বেশী কিসে হোল তা' সুদাম ভেবে পেলে না, কিন্তু রাধার ঠাট্টার সুর সে বুঝ্‌তে পারলে, তার কান্না পেলে। সে মৃদুস্বরে বল্লে, "তবে দেবে না, তাই বল্‌চ?"

রাই হাসি চেপে বল্লেন "ওরে বনের রাখাল! বনে গরু চরানো হোচ্চে তোর কাজ। তুই তাই

মুক্তো দিয়ে গরু সাজাতে চাচ্ছিস! মুক্তো কিসে হয় তা জানিস্? আকাশে স্বাতি বোলে একটা নক্ষত্র আছে, শীতকালে শিশির যখন শুক্তির উপর পড়ে, তখন কখনও কখনও সেই স্বাতি-নক্ষত্রের জ্যোতিটুকু সেই শুক্তির ভিতরকার শিশিরে গিয়ে পড়ে, তাতে শুক্তির মুখটা বুজে যায়,—তাতেই দুর্ল্লভ মুক্তোর জন্ম হয়; রাজরাজড়া ছাড়া এ মুক্তো কেউ পর্‌তে পারে না; তুই কিনা এই মুক্তো দিয়ে গরু সাজাবি? তুই গরুর রাখাল কিনা—না হলে এমন বুদ্ধি কেন হবে?"

ললিতা বল্লে—"যা, তোর কানাইকে পাঠিয়ে দিগে।"

সুদেবী ডান হাতখানি দিয়ে সুদামের চিবুক ধরে ঠাট্টা করে বল্লে, "রাখাল জাত একবার রাজ-পুরীতে আমল পেয়ে মাথায় উঠে বসেছে!"

চম্পকলতা বড় নম্রস্বভাবের মেয়ে, সে ঠোঁট

বেঁকিয়ে হেসে এই ঠাট্টায় যোগ দিলে, আর কিছু বল্লে না।

৮

তখন সুদামের চোখের জল যেন ঠেলে উঠ্‌ল। সে অতি কষ্টে রাধার দিকে চেয়ে বল্লে, "দামের কথা ত জানিনে, তবে কৃষ্ণ কিছু চাইলে যে তুমি দেবে না, তা তো জানতুম না! আমাদের তো প্রাণ চাইলে প্রাণ দিতে পারি।"

শুধু তামাসা করতে গিয়ে রঙ্গদেবী বল্লেন—"তোদের রাখালের প্রাণের আর দাম কি রে? থাকবার মধ্যে ত একটা পাচনবাড়ি! রাজকন্যার প্রাণ কি অত সস্তা?"

সুদাম চোখের জল রাখ্‌তে পারলে না। সে যে তার মায়ের আঁচলের মণি, রাখালদের কত আদরের,—ভাই-কানাই যে তার সঙ্গে খেলা করতে

ভালবাসে। সে এই প্রথম শুন্‌লে তার প্রাণের কোন দাম নেই। রাজকন্যা হোলেই কি তার দাম? সে তো কতকগুলি গয়না পত্রের দাম। সে কার দুলাল? যার দুলাল তাকে ছেড়ে দিলে তার আর দাম কি থাকে?

সে তো এত কথা বল্‌তে পারলে না। সে চোখ মুছে কাঁদ-কাঁদ সুরে জিজ্ঞাসা কল্লে, "তবে রাই, তোমার কানুকে মুক্তোটা দেবে না ভাই?"

রাধার বুকটা ধড়াস্‌ কোরে উঠল। বিশাখা গা টিপে কানের কাছে মুখ রেখে বল্লে, "রাই, বড্ড বাড়াবাড়ি হোচ্চে।" রাই ভাব্‌লেন, "কানুকে মুক্তো দেবো না? তার পায়ে যে যথাসর্ব্বস্ব ও প্রাণটা দিয়ে রেখেছি!"—রাইএর চোখে জল এল। কিন্তু একবার এত ঠাট্টা করেছেন, এখন আবার কি করে সুরটা বদলাবেন, কেমন বাধ-বাধ

ঠেক্‌তে লাগ্‌ল। তার পরে ভাব্‌লেন "আসুক না! সে কি না এসে পার্‌বে? আমার রাগের কথা শুন্‌লে ত সে ছুটে এসে পায়ে পড়্‌বে, আসুক না পায়ের উপর তার ময়ূরের পাখা লোটাক্ না! তবে দেব। মুক্তো কেন, যা চায় তাই দিয়ে ভিখারিণী সাজ্‌বো।"

৯

তখন হাস্‌তে হাস্‌তে সেই কাঁদ কাঁদ ছেলেটার মুখের দিকে কৌতুকের দৃষ্টিতে চেয়ে রাই বল্লেন, "হাঁরে, তোদের কানু বুঝি মুক্তো বুনে লতা তৈরী কর্‌বে? আর তাতে থোলো থোলো মুক্তো ফল ফল্‌বে? গরু চরাতে চরাতে বুদ্ধিটাও সেই রকম হোয়ে গেছে। আর দাঁড়িয়ে দেখ্‌ছিস্ কি? গরুর রাখাল বনে চলে যা! 'হারেরে' কোরে গান কর্ত্তে ভুলিস্ নে।"

রঙ্গদেবী সুদামের পাচনবাড়িটা ধোরে টানা-টানি করতে লাগ্‌ল এবং বল্লে "এর বাড়ি না খেলে কি গরু আর রাখাল চল্‌তে চায় ?"

তখন সুদাম রেগে বল্লে, "ভাই কানাইকে নিয়ে এত ঠাট্টা ! আমায় নিয়ে এত ঠাট্টা ! এর শোধ তোমরা পাবে।"

আর কিছু বল্‌তে পার্‌লেন না। কাঁদতে কাঁদতে সুদাম ফিরে চল্ল। তখন শেষ-বেলার রোদটুকু মায়ের তুলালের চোখের জলের উপর প'ড়ে মুক্তোর মত টল্‌টল্ কচ্ছে, সেই মুক্তো নিয়ে শুধু-হাতে সুদাম ভাই-কানাইয়ের কাছে নালিস কর্ত্তে গেল।

১০

সুদাম যতই যমুনার পারের দিকে আস্‌ছে, ততই তার চোখের জল উথ্‌লে উথ্‌লে উঠেছে।

* মুক্তা চুরি *

"ভাই কানাইকে এত অপমান? যার জন্যে আমরা সব দিতে পারি, যার পায়ে কাঁকর না বেঁধে সেজন্যে আমরা পথে বুক পেতে রাখ্‌তে পারি—তার উপর এতটা অশ্রদ্ধা? রাজপুরী কি ছাই!—আমরা ও চাই না! যে একটু হাস্‌লে তা দেখে আমরা মা বাপ পর্য্যন্ত ছেড়ে দিয়ে সেই হাসি দেখবার জন্যে পিছন পিছন ফিরি, তাকে তুচ্ছ করে একটা মুক্তোর বড়াই? মুক্তোতে কি আছে? ও ত পদ্মফুলের মত কোমল নয়, ওতে ফুলের গন্ধ নেই—মুক্তো কি ছাই! আমি কেন কানুকে বল্‌তে গেলুম, গরুকে মুক্তো দিয়ে সাজাব, তাইতে তার এত অপমান হোল! গরুগুলি ও মুক্তো পর্‌বে কেন? তারা কথা বল্‌তে পারে না, তবু ভাই-কানাইকে কত ভালবাসে—না দেখ্‌তে পেলে পথ পানে চেয়ে থাকে। তাদের জন্য ভাই-কানাইএর অপমান? তারা ও মুক্তো পর্‌বে কেন?"

শ্রীদামের দুই চোখে জল গড়িয়ে পড়্ছে, অলকা তিলকা সেই জলে ভেসে গেছে, কানুর অপমান শেলের মত তার বুকে বিঁধ্ছে। সে দূর থেকে রাখালদের দেখে, কেমন করে তাদের কাছে দাঁড়াবে, কি বল্বে, ভেবে পাচ্ছে না, পা যেন এগুচ্ছে না।

১১

কানাই দূর থেকে সুদামকে দেখে ছুটে এসে উপস্থিত হোলেন। মুক্তোটা দেওয়ার সময় রাইএর ঠোঁটে যে হাসিটুকু ফুটেছিল, তা সুদাম দেখ্তে পেলে—আমি পেলুম না! সে না জানি আমার প্রেমের গরব ক'রে কত কথা বলেছে! কি কি বলেছে, বিনিয়ে বিনিয়ে তা' জিজ্ঞাসা কর্বেন, এই আশায় তিনি ছুটে এসে সুদামের হাত দুখানি ধর্লেন। কিন্তু এ কি? সহসা পায়ে

কাল সাপ ঠেক্‌লে যেমন পথিক থমকে দাঁড়ায়, সুদামকে দেখে তার তেমনই হোল।

সুদাম ভাই-কানাইএর পায়ে পড়ে কাঁদতে লাগ্‌ল। সে চোখের জল আর থামে না। "কানাই আমারই জন্যে তোর অপমান হোল! আমার বড় শক্ত প্রাণ, তাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে সকল কথা শুন্‌লুম। তোকে কেন মুক্তোর কথা বল্‌তে গেলুম? তাই তো এত কথা শুন্‌তে হোল, আমার বুকটা ছিঁড়ে গেছে, মনের মধ্যে রক্ত থাক্‌লে দরদর করে পড়্‌তো, তুই দেখ্‌তে পেতিস্। দে তোর্ হাত আমার বুকে বুলিয়ে দে। আর কিছুতে এ বুকের জ্বালা জুড়োবে না। আহা বাঁচলুম!—তোর হাতের এই পরশের চেয়ে দামী জিনিস না-কি কোথাও আছে?" সুদাম কৃষ্ণের পায়ে পড়ে কাঁদতে লাগ্‌ল।

কৃষ্ণ স্থির হোয়ে দাঁড়ালেন, বিদ্যুৎভরা মেঘের

মত স্থির হোয়ে দাঁড়ালেন ; সেই ময়ূরপুচ্ছের নীল চূড়া সেই কালো রংএর উপর যেন বিদ্যুৎ হেনে গেল। আর কিছু শুন্‌তে চাইলেন না ; জিজ্ঞাসা কর্‌বার ভরসা হোল না ; বুঝলেন রাই তাকে ঠাট্টা করেছে, মুক্তো দেয় নি, সইরা টিট্‌কারী দিয়েছে, তা না হলে কি আর সুদাম ভাইয়ের মনে এত কষ্ট হয় !

তিনি আর কিছু না ব'লে—সুদামকে সেইখানে রেখে চলে গেলেন। তাকে বলে গেলেন, "ভাই, দুঃখ কোর না, আমি তো তোমাদেরই আছি ; আমায় দেখেই তো তোমরা সব দুঃখ ভুলে যাও, তবে কাঁদছ কেন ? আমি কি আজ আনন্দ দিতে পাচ্ছি না ? তোমরা থাক, আমি এই আস্‌ছি।"

এই বলে কৃষ্ণ চলে গেলেন।—সুদাম ভাব্‌লে, "তাই তো আমাদের আবার দুঃখ কি ? আমরা যে দুঃখ সুখ সমস্তই ভাই-কানাইকে দিয়ে ফেলেছি।"

তখন সে উঠে আর আর রাখালদের কাছে চলে গেল। তারা কত প্রশ্ন কর্‌তে লাগল—সেই সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে সুদামের ঠোঁট দুখানি কেঁপে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। অংশুমান বল্লে, "তারা ভাই-কানাইকে ঠাট্টা করেছে? এর শোধ ভাই-কানাই দেবে—আমরা সবাই মিলে দেবো।"

সকল রাখাল সেই জায়গায় ব'সে ব'সে তাদের দুঃখ ও ক্ষোভ প্রকাশ কর্‌তে লাগ্‌ল। গরুগুলি ছুটাছুটি কচ্ছিল, তারাও যেন কি আশঙ্কা কোরে সেইখানে এসে ছবির মত দাঁড়িয়ে রইল। বৃন্দাবনের রক্তমালতীগুলি সূর্য্যাস্তের লাল রঙ্গে আরো লাল হয়ে উঠ্‌ল। ভ্রমরগুলি গুণ গুণ কর্‌তে কর্‌তে যেন তাদের দিকে আর এগিয়ে এল না; যেন হাওয়ায় কি একটা উড়ে এসে প্রেমের লীলা নিবিয়ে দিয়ে গেল।

১২

কৃষ্ণও মায়ের কাছে এসেছেন।—“হ্যাঁরে আজ এত সকাল সকাল এলি যে? বলাই দাদা কোথায়? যা, এসেছিস, ভাল করেছিস, আর ফিরে আজ যেতে দেবো না।” এই বলে মা যশোদা তাকে বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধর্‌লেন।

“মা, তোমার কাছে একটা দরকারে এসেছি।”

“কি দরকারে? মাখনের বড় ভাঁড়টা বুঝি? ওটা দিলে আমার ভারি অসুবিধে হবে, তোদের বনভাতি খাবার মত আরও অনেক ভাঁড় পড়ে আছে, তার একটা দেব এখন।”

“না মা, আমি ও-সব চাই না, আমায় তোমার ঐ কাণের দুল্‌ থেকে একটা মুক্তো খুলে দিতে হবে। ‘না’—বোল্লে শুন্‌ব না—দিতেই হবে!”

“হাঁরে, কানু, তুই কি পাগল হোলি নাকি? ও মুক্তো দুটোর দর জানিস?”

"জানি গো জানি, আর দরের কথা শুনতে চাই না—সব জিনিষেরই দর আছে,—কেবল দর নেই তোমার রাখাল ছেলেটির! আমি কেবল মার-ধোর খাবার বেলায় আছি। এক কড়া ননী চুরি করে খেলে বেঁধে রাখবে,—তার বেলায় আছি। আর দরের বেলায় ওই মুক্তো দুটো। কার কেমন দর মা, তা এবার দেখিয়ে দেব—এই যাচ্ছি যমুনায় ঝাঁপ দিয়ে মরতে! সেদিন কালিদয়ে সাপের মুখে পড়েছিলেম, তাতে এত কেঁদেছিলে কেন মা? আমি তোমার মুক্তোর চাইতে বেশী কি না, তা এবার ম'রে দেখাব।"

মায়ের মনে যাতে নিদারুণ আঘাত লাগে সেই সব কথা শুনে যশোদা কানুকে জড়িয়ে ধল্লেন এবং বল্লেন, "ষাট্ বাছা, অমন সব কথা কি বলতে আছে? তুমি চিরায়ু হোয়ে বেঁচে থাক। মা পার্ব্বতী, মা লক্ষ্মী তোমায় সকল বিপদ থেকে রক্ষা করুন।

তোর অভাগিনী মা তো তোর মুখের দিকে চেয়েই আছে। তুই যে আমার কত দুঃখের ধন, তা রোহিণী দিদি জানেন।" এই বলে যশোদা আঁচলে চোখ মুছ্‌তে লাগ্‌লেন।

১৩

এই ত চান! কৃষ্ণ মায়ের কোলে বসে হাত পেতে বল্লেন, "দে, মা, একটা মুক্তো দে, তুই আর কাঁদিস্‌নে মা, তোর মুক্তোটার লোভ ছেড়ে দিয়ে ছেলের উপর মায়াটা একটু দেখিয়ে দে।"

সেই নীলপদ্মের কলির মত হাতখানি পেতে যখন মুক্তোর কাঙ্গাল মায়ের দিকে মিনতি কোরে চেয়ে রইল, তখন মা কি কোরে তার নিবেদনটা অগ্রাহ্য করেন? তিনি কখন্ কি ভাবে দুল্ থেকে একটা বড় মুক্তো খুল্লেন ও সেই ভিখারী ছেলের পাতা-হাতে দিলেন, তা তিনি যেন নিজেই

জান্‌তে পাল্লেন না,—তখন রাণী কেবল কৃষ্ণের মুখের দিকে জল-ভরা চোখে চেয়ে ছিলেন। যে মুখ দেখ্‌লে তিনি তার বৃন্দাবনের রাজত্বটা কাণা-কড়ির মূল্যে ছেড়ে দিতে পার্ত্তেন, সেই মুখখানি দেখ্‌ছিলেন। এই ভাব মুহূর্ত্তকাল ছিল—তারপর যখন চোখ চেয়ে দেখ্‌লেন, তখন জান্‌তে পাল্লেন, সেই মুক্তোটা পেয়ে একটা উড়ন্ত পাখীর মত কানাই ঝাঁ করে উড়ে চ'লে গেছে। সেই বাড়ীর বাগানের শেষ-সীমায় মাধবীলতার উপর ময়ুর-পুচ্ছের নানা রং সূর্য্যের আলোতে ঝলক্ খেল্‌ছে; আর একটু পরে আকাশের নীলিমায় তাও মিশে গেল।

১৪

এইবার যমুনার পাড়ে রাখালদের ভারি উৎসব। তারা একটা জায়গা খুব ভিজিয়ে কাদা

কোরে ফেলেছে। মুক্তোটা এ, ওর হাত থেকে নিয়ে নিরীক্ষণ করে দেখে প্রশংসা কচ্ছে। কেউ বিশাখাকে গালমন্দ দিচ্ছে, "ওরই পরামর্শে তো রাই সব কাজ ক'রে থাকে! ওই সখীটাই রাইএর মাথাটা বিগ্‌ড়ে দিয়েছে।" কেউ বলছে, "এখন বল ভাই, রাইএর মান থাকবে কোথায়? ভাই-কানাই রোজ-রোজ ময়ুরপাখার চূড়োটা শুদ্ধ ওর ~~পায়ে~~ লুটিয়ে পড়ে, তাইতে এত গুমোর বেড়েছে, আজ রাইএর মাথার সিন্দূরে আমাদের ভাই-কানাইয়ের পাদুখানি রাঙ্গিয়ে উঠ্‌বে, তবে ছাড়্‌চি।" আর একজন বল্লে, "আজ যে সুবল বড় চুপ করে রইলে? তুমি তো ভাই-কানাইয়ের মন্ত্রগুরু; তুমিই তো রাধা বলে বাঁশী বাজাতে শিখিয়েছ, রাই সেজে কানুকে তুমিই তো ভুলিয়েছিলে—তার প্রশংসা তো আর তোমার মুখে ধরে না, আজকের ব্যাপারটা কি, তাই বুঝিয়ে বল না?" এই রকম বলাবলি

কোরে তারা আনন্দে চীৎকার কচ্ছে। রাধার এক দাসী যমুনায় জল নিতে এসে দেখে গেল, এদের যেন আজ কি উৎসব চলেছে। শ্যামলতার আড়াল থেকে দেখে ঠিক ঠাওর কর্ত্তে পার্‌লে না। "কই কোন জিনিষ-পত্র ত কিছুই নেই, তবে কি নিয়ে এত আমোদ কচ্ছে? রাখাল কি না, হয়ত কোন জায়গায় একটা ফুল কি ফল কুড়িয়ে পেয়েছে, তাই নিয়ে এত আমোদ কচ্ছে। যাক্ গে!"

১৫

আজ রাধার মনের মধ্যে একটা ভাবনা চলেছে; বুকের উপর কি যেন চেপে বসেছে। রাত-দুপুরে তো সে আস্‌বেই; কিন্তু এই "আসবেই" কথাটায় যেন মন সায় দিচ্ছিল না। যদি না আসে? রাধা সে কথা ভাব্‌তে পাল্লেন না, —সে বড় অসহ্য কথা।

তারপর সখী যখন যমুনার পাড় থেকে ফিরে এসে রাখালদের আনন্দ করার কথা বল্লে, তখন যেন রাধা মুস্‌ড়ে গেলেন—তার কেবলই বিশাখার কথাটা মনে হোতে লাগল, "রাই বড্ড বাড়াবাড়ি হোচ্ছে।"—"রাখালেরা আমোদ কচ্ছে? সে কিসের আমোদ? সে আমোদে নাকি কানু উঠে-পড়ে লেগেছে? আমায় ছেড়ে তার কিসের আমোদ? আমি রাগ করেছি শুন্‌লে ত কেঁদে ভাসিয়ে দেবার কথা!—সে কি ক'রে আমোদ কর্ত্তে পারে? অসম্ভব।" তিনি সখীকে নিরালায় ডেকে এনে বল্লেন—"সেও কি সেই আমোদের ভিতর ছিল, তুই নিজের চোখে দেখেছিস?" সে বল্লে—"সেই তো হোচ্ছে মূল! তাকে ছেড়ে আবার রাখালদের আমোদ-আহ্লাদ কবে হয়? তারা কত গান কচ্ছে, কত চেঁচামিচি কচ্ছে, তাদের সঙ্গে কানাইয়ের কত উৎসাহ!"

* মুক্তা চুরি *

রাধা এখন বুঝলেন, সে কথা ঠিক্। কানুই হচ্ছে তাদের চোখের উৎসব, মনের উৎসব! তাকে ছেড়ে আবার তাদের উৎসব আছে কি? "আমারই কি আছে?" এই ভাব্‌তে রাধার গলার গজমুক্তোর হারটা বিষের মতন ঠেক্‌তে লাগ্‌ল, ইচ্ছে হোল তখনই তার মাঝের বড় মুক্তোটা তিনি গুঁড়ো কোরে পথের ধূলায় ফেলে দেন। কিন্তু সখীরা দেখে কি ভাব্‌বে? এই লজ্জায় কিছু কল্লেন না। কিন্তু মুক্তোর মালাটা তার বুকের ভিতরকার কানুর ছবিখানিকে যেন আঁড়াল কোরে দাঁড়িয়েছে, এ তো আর সহ্য হয় না। যে পথ দিয়ে কৃষ্ণ আস্‌বেন, সেই পথের দিকে রাইএর চোখ দুটি পড়ে রইল; সেই পথের হাওয়ায় গা যেন আনন্দে শিউরে উঠ্‌লো, এবং চোখে জল আস্‌তে লাগ্‌ল। "যদি না আসেন?—তা হোতেই পারে না, তাঁকে আস্‌তেই হবে। না এলে আমি কি কর্‌ব,—জানি না।"

সন্ধ্যাকালে শ্যামলতাটির মূলে গিয়ে প্রণাম কোরে, নিজের মাথার সিন্দূরে সেখানটা রাঙ্গিয়ে দিলেন।

১৬

এদিকে কৃষ্ণ মুক্তোটি একটা বিচির মতন বুনেছেন। তার অঙ্কুর দেখা দিয়েছে। দুটি ছোট্ট পাতা নিয়ে একটা শ্যামবর্ণ চারা মাটি থেকে মাথা বার কোরেছে। কৃষ্ণ সখাদের ডেকে বল্লেন, "কাল দুপুরে মুক্তো ফল ফল্‌বে, আজ সন্ধ্যা হোয়েছে। মা আমার ব্যস্ত হোয়ে আছেন; চল আমরা বাড়ী ফিরে যাই।"

তখন বলরাম শিঙ্গায় ফুঁ দিলে। রাখালেরা বেণু বাজাতে বাজাতে ছুট্‌লো! মধ্যে ভাই-কানাই! তার ময়ূর পাখার উপর সূর্য্যের আলো ঝল্‌কে উঠল, যেন নীল মেঘখানির উপর রামধনু দেখা

দিয়েছে। কৃষ্ণের নীলে-কালোয় মেশানো অঙ্গের জ্যোতি সেই বনটাকে উজ্জ্বল কোরে তুল্লে; তাঁকে ঘিরে রাখালেরা চলেছে। গরুগুলি ঘাস খেয়ে উদর পূর্ত্তি কোরেছে; এখন হেল্‌তে-দুল্‌তে যেন কানুর বাঁশী শুন্‌তে-শুন্‌তে চলেছে। সে বাঁশীর সুর বৃকভানুপুরে রাধার কাণে এসে প্রবেশ করেছে; কিন্তু এ কেমন রাগিণী? এ তো আহ্বান নয়, এ যেন বিদায় গান! রাধা নামে সাধা বাঁশী, রাধা নামটি তো ছাড়্‌তে পারে না! কিন্তু এ তো সেই করুণ মন-ভুলান সুর নয়, এ তো 'রাই এস,' 'রাই এস' ব'লে বাজ্‌ছে না,—এ তো প্রাণ টেনে নেবার সুর নয়—এ যেন ছুটির গান। "তুমি আমায় চাইলে না! আমি তোমার দুয়ারে ভিখারীর মত ঘুরে গেলুম, তুমি ভিখারীর মত আমায় বিদায় ক'রে দিলে, তোমার কাছে জুড়োতে চেয়েছিলেম, তুমি স্থান দিলে না! আমি তোমার আশা ছাড়ব না,

কিছুতেই ছাড়্ব না, তুমি তো আমার আপনার। কিন্তু যে পর্য্যন্ত আমায় চাইবে না, সে পর্য্যন্ত আমি আস্‌ব না। তুমি পৃথিবীর সমস্ত মুক্তো ঝুড়িতে তুলে নাও, দেখ্‌বে তোমার মনের তাতে তৃপ্তি হবে না। যখন জ্বলে-পুড়ে আস্‌বে, তখন আমি ছাড়া যে তোমার কেউ আপনার নয়, তাই বুঝে চোখে জল পড়্‌বে—সেইদিন আমায় পাবে,—কতদিন পরে—তা বল্‌তে পারি না কিন্তু আমি অপেক্ষা করে রইলুম, আজ ছুটি।"

১৭

বাঁশী কঠিন সুরে বেজে গেল। রাধার মর্ম্মে বেদনা দিয়ে সেই সুর বেজে গেল। এ তো মানের পালা নয়, কৃষ্ণও ত মান করতে জানেন, রাধাও তো তাকে সেধেছেন,—কিন্তু এ তো তেমন মান নয়। বাঁশীর বজ্র-কঠোর সুরে রাধার আত্মা চমকে উঠ্‌ল। সেই যে অপেক্ষা করার কথা—

ভালবাসার কথা আছে, তা' কতদিন পরে? "তাঁকে ছাড়া একদিন যে এক-যুগ! তাঁকে ছাড়া দুদিনে যে ম'রে যাব! বাঁশী আমায় মের না,—আমায় এই কঠোর শাসন কোরো না। আর যা হয় তাই কোরো,—আমায় ছেড় না। আমার মাথা থেকে মণিমুক্তো'র বোঝা নামাও, আমি সকলের পায়ের ধূলো হয়ে থাক্‌ব—কিন্তু বাঁশী, আমি ছেড়ে থাক্‌তে পার্‌ব না। কি নিয়ে থাক্‌ব?" ——

সেই সন্ধ্যাকালে গলায় আঁচল দিয়ে রাধা তুলসীমঞ্চের কাছে গিয়ে বল্লেন—"তোমায় লোকে কৃষ্ণপ্রিয়া বলে, আমি তো তাঁর অপ্রিয় হোয়েছি, আমাকে তোমার চরণে একটু জায়গা দাও।" রাধার চুলগুলির উপর থেকে মালতী মালাটা খ'সে গিয়ে সেই তুলসীর মূলে লুটিয়ে পড়্‌লো,—সেই-খানে তাঁর চোখের জল বিন্দু বিন্দু পড়ে মঞ্চটিকে যেন করুণায় অভিষেক করে দিলে।

১৮

এদিকে আকাশের গায়ে গরুর পায়ের ধূলি উঠে গোধূলির সৃষ্টি কোরেছে? সারি সারি প্রদীপ জ্বেলে বৃন্দাবনের মায়েরা রাখালদের বাড়ী-ফেরার প্রতীক্ষা কচ্ছেন। তাঁরা নিজ নিজ ছেলেদের চাইতেও কানাইএর জন্য বেশী উতলা হোয়ে পড়েছেন; কারণ কানাইএর মঙ্গলেই তো তাদের মঙ্গল। বনে আগুণ লাগ্‌লে তো কানাই তাদের রক্ষা করে! কংসের চর তো বনে সর্ব্বদাই ঘুর্‌ছে, তাদের হাত থেকে ত কানুই তাদের বাঁচিয়ে দেয়। একদিন রাখালেরা বিষজল খেয়ে মরেছিল—সেদিন কানু না থাক্‌লে কে রক্ষা কর্‌তো?

সহসা শিঙ্গা বেণু ও বাঁশীর রবে আকাশ ভ'রে গেল। রাখালদের কলরব ও গান, গরুর পায়ের শব্দ—হাসি ঠাট্টার রোল—সেই পথে উৎসবের সৃষ্টি

কল্লে। "ওগো কানাইএর মা! কানাই এসেছে। ওগো রোহিণী! রাম এসেছে।"—সাড়া পড়ে গেল। তখন ব্রজের মেয়েরা দীপ হাতে নিয়ে সার দিয়ে দাঁড়াল। কেউ ফাগ ছড়াতে লাগ্‌ল। কেউ মুঠো মুঠো খই উড়িয়ে দিতে লাগ্‌ল। ধূপধূনোর গন্ধে, ধোঁয়ায় ও ফাগে আকাশ কোথাও আঁধার হোয়ে উঠ্‌লো, কোথাও লাল হোয়ে উঠ্‌লো। কেউ শাঁখ বাজাতে লাগল, কেউ হুলুধ্বনি করে উঠ্‌ল। ঐ যে রোহিণীকে ডানদিকে কোরে মা-যশোদা আস্‌ছেন; তাঁর হাতে পাঁচটি প্রদীপ। তিনি কানুকে ধান দূর্ব্বা দিয়ে বরণ কোরে নিচ্ছেন,—তার মুখের উপর পঞ্চপ্রদীপটি ঘুরোচ্ছেন, আর চোখের জলে চেয়ে দেখ্‌ছেন। চৌদিকে ফাগ্ উড়ছে, তার লাল রং পঞ্চপ্রদীপের আলোতে উজ্জ্বল হোয়ে কালো রূপকে কি সুন্দর ক'রে দেখাচ্ছে! ব্রজ-মেয়েরা সেই কৃষ্ণের আরতিতে তাঁদের সকলের বাৎসল্যের

কৃষ্ণের আরা … লাভ কচ্ছেন।

—৩৬ পৃষ্ঠা।

চরিতার্থতা লাভ কচ্ছেন। ব্রজের মায়ের প্রাণ—শিশুদের কল্যাণের জন্য, তাদের আশীর্ব্বাদ করার জন্য, তাদের দেখে আনন্দ পাওয়ার জন্য—যেন যশোদা ও কানুর মিলনে মূর্ত্তি ধোরে দাঁড়িয়েছে।

১৯

পরদিন ভোরের বেলা রঙ্গিয়া পাগড়ী মাথায় সুদাম এসে যশোদার আঙ্গিনায় উপস্থিত।

বলাইয়ের শিঙ্গা বেজে উঠেছে, আর কি থাক্‌বার যো আছে? যশোদা কানুকে মনের মত সাজিয়ে বলাইএর হাতে সঁপে দিলেন।

নীল ধুতি পরা বলাই আগে আগে চল্লেন, পিছনে পিছনে কানাইকে ঘিরে রাখালের দল গরু নিয়ে চল্লো। আজ ভারি স্ফূর্ত্তি, মুক্তোর চারা হোয়েছে; আজ দুপুরবেলা তাতে মুক্তো ফল্‌বে।

* মুক্তা চুরি *

ছেলেরা গিয়ে দেখ্‌লে—একটা মুক্তার চারা প্রায় একপো জায়গা জুড়ে মাঝে মাঝে শিকড় নামিয়েছে। শ্যামবর্ণ ছোট ছোট পাতা, তার মাঝে মাঝে মুক্তোর দানা, সে যে কি সাদা সাদা, সুন্দর! কৃষ্ণ বল্লেন—"দুপুরবেলা এগুলো শক্ত হবে, আরও বড় হবে।" তখন রাখালদের আমোদ দেখে কে! তারা সেই মুক্তোলতার চারিদিকে নৃত্য কর্‌তে লাগ্‌ল।

কেবলই ঘুরে ঘুরে তারা থোলো-থোলো দানা দেখ্‌ছে। প্রথম হয়েছিল তারা ছোট ছোট হিম-কণার মত; তারপর হোল বরফের টুক্‌রোর মত। যতই বেলা বাড়তে লাগ্‌ল, রোদ পেয়ে সেগুলি শক্ত হোতে লাগ্‌লো। ঠিক দুপুরবেলা তারা পাতার গায়ে দুল্‌তে লাগ্‌ল,—যেন শ্যামবর্ণ মেয়ের নাকের নোলক। একটি দুটি নয়, শত শত। শত শত নয়, হাজার হাজার! ঝাড়ের দুলের মত রোদের

তেজে তারা জ্বল্‌তে লাগ্‌ল—তাদের দিকে চাওয়া শক্ত হোল, যেন রোদের কণা জায়গায় জায়গায় জমা হোয়ে শক্ত হোয়ে উঠ্‌ল—সেগুলির দিকে তাকালে চোখ ঝলসে যেতে লাগ্‌ল। দুপুরের পরে কৃষ্ণ বল্লেন—"এখন সরু দেখে বনলতা নিয়ে আয়, মুক্তো তুলে মালা গেঁথে গরু সাজাব।"

২০

রাতে কৃষ্ণ যান নি, রাই এই এক রাতেই কেমন হোয়ে গেছেন! তার চোখের পাতা দুটি শিশিরে ভেজা পদ্মের পাপড়ির মত হোয়েছে। সারা রাত কেঁদেছেন—যতবার গাছের পাতা নড়েছে, ততবার দুয়ারের কাছে উঠে এসেছেন। বাঁশীর সঙ্কেত শোনবার জন্য কাণ পেতে রয়েছেন। ফুলের মালা গলায় শুকিয়ে গেল; চন্দ্রকান্ত মণির জ্যোতি নিভে এল; ভোরের বাতাস গায়ে এসে লাগল;

তখন শিউরে উঠ্‌লেন—"সে তো এল না, সে কি তবে আমায় ছাড়্‌লে? সে ছাড়্‌লে আমি তো তাকে ছাড়্‌তে পারি না, আমি কাণে কুণ্ডল পরে যোগিনী হোয়ে বনে বনে তপস্যা করব। কি ছাঁর এই মণিমুক্তো! এদের জন্য কানুকে হারাব?"

বিশাখা বল্লে—"রোজই যে আস্‌বে এমন তো কথা নেই। তবে কাজটা আমাদের ভাল হয়নি। তা' আজ গোঠে তো নিশ্চয়ই এসেছে, যা না রঙ্গদেবী, সুদেবী, চিত্রা, তোরা না হয় দেখেই আয় না, সে যমুনার পারে কি করছে। হয় তো এতক্ষণে মুস্‌ড়ে পড়েছে,—বাঁশী ফেলে কদমতলায় শুয়ে "হা রাই" "হা রাই" কোরে কাঁদছে। লজ্জায় আস্‌তেও পার্‌ছে না, রাইকে ছেড়ে থাক্‌তেও পারছে না। আমাদের দিক্ থেকেও কোনো খোঁজ-খবর নেই! কাল্‌কের কাজটা আমাদের অসঙ্গত হোয়েছে বল্‌তেই হবে, অতটা করা উচিত হয় নি।"

মুক্তো নেবার চেষ্টায় লতাটার আড়াল হোতে হাত বাড়ালে।

—৪১ পৃষ্ঠা

Emerald Ptg. Works, Calcutta.

২১

জল আন্‌বার ছুতো করে রঙ্গদেবী, চিত্রা ও ও সুদেবী যমুনার তীরে এল। সে কি দৃশ্য! রাখালেরা যেন শত-সহস্র আকাশের তারা কুড়িয়ে পেয়ে নিপুণ হাতে মালা গাঁথতে বসেছে; মস্ত বড় মুক্তোর বন, তাতে আরও কত মুক্তা ফলে রয়েছে। কানু নিজে বাঁশীটা একদিকে রেখে মালা গাঁথছে, তাই বাঁশী আর বাজ্‌ছে না, রাধা নামে সাধা বাঁশী আজ চুপ চাপ্।

রঙ্গদেবী কয়েকটা মুক্তো ছিঁড়ে নেবার চেষ্টায় লতাটার আড়ালে এসে দাঁড়িয়ে হাত বাড়ালে; তার নীলাম্বরীর উপর এক থোপা মুক্তোর আলো উজ্জ্বল হোয়ে উঠ্‌ল। কিন্তু সুদাম দেখ্‌তে পেয়েছিল—সে আঙ্গুল দিয়ে দেখালে—"ভাই-সকল, মুক্তোর চোর দেখ্‌বে? মুক্তো বনে চোর ঢুকেছে।"

* মুক্তা চুরি *

আধা-গাঁথা মালা ফেলে পাচনবাড়ি হাতে রাখালেরা হেঁকে উঠ্‌ল—"কে ?" "কে ?" তখন রঙ্গদেবীর মুখ এতটুকু হোয়ে গেল। চিত্রা ছুটে যেতে শাড়ীর আঁচল পায়ে বেধে হোঁছট খেলে। সুদেবী মধু-কণ্ঠের সম্মুখে পড়ে লজ্জায় চোখ নামিয়ে যেন যমুনা-তীরের বালি গুণ্‌তে লাগল। সুদাম এগিয়ে এসে বল্লে—"লজ্জা হোচ্ছে না ? কানুকে একটা মুক্তো দিলে না। তোদের রাই না কানুকে বড্ড ভালবাসে ?—একটা মুক্তোর দামে আমাদের কানু তার কাছে বিকোল না, এই রাইএর ভালবাসা ? কত কটু বলেছে। আমায় বোল্‌তো—আমি পায়ে ধরে বলতুম—যদি অপরাধ করে থাকি, তবে ক্ষমা কর। কিন্তু কৃষ্ণদ্বেষীর মুখ আমরা দেখি না।" তখন "চোর ধোরেছি" বলে অংশুমান, বসুদাম ও মন্দার সখীদের পথ আগ্‌লে দাঁড়াল। "চুরি কর্‌তে এসেছ, গালে চুণকালী দিয়ে ছাড়্‌বো। শাস্তি

নিতে হবে—অমনি যেতে পার্‌বে না।” চিত্রা বড় সহজ মেয়ে ছিল না, সে কলসী মাটিতে নাবিয়ে রেখে আঁচল কোমরে এঁটে বেঁধে চোখ রাঙিয়ে অংশুমানকে বল্লে—“তোদের বড্ড সাহস বেড়ে গেছে দেখ্‌ছি! চিরদিন গয়লাদের ক্ষীর সর চুরি করে খেয়ে তোরা দাগী হয়ে আছিস্ জানিস্ না, এখন উল্টো বিচার কর্ত্তে এসেছিস্? এক থোপা মুক্তো যদি নিয়েই যাই, তবে তোরা কি কর্ত্তে পারিস্ বল্—এ বৃন্দাবনে তো রাই রাজা, তোরা মুক্তো বুনেছিস্—ফল ফলেছে, তার জন্য এত দেমাক কিসের? রাজার নজর দে!” রঙ্গদেবীরও মুখ ফুটে গেছে—সে বল্লে, “কই রাইএর কাছে যে দাসখৎ লিখে দিয়েছে, সে কেনা-গোলামটা কই? তার যদি কোন সম্পত্তি থাকে, তবে তো সে যার দাস—তারই সে-সব। সে এসে অস্বীকার করে যা'ক্!” এ সময় কৃষ্ণ

এসে দাঁড়িয়ে বল্লেন—"অস্বীকার কচ্ছি না, আমি রাধার কেনা-গোলাম—সে তো আমরা ভাগ্যি; কিন্তু রাই আমায় পায়ে রাখ্‌লেন কই? আমায় তিনি ছেড়েছেন—আমার উপর তোমাদের কোন দখল নেই, আমি বৃন্দাবন ছেড়ে পালাব—আমায় যখন তোমরা খুঁজবে—তখন পাবে না।" সুদাম বল্লে, "এই কোরেই তো ভাই, তুই এদের আস্পর্দ্ধা বাড়িয়ে দিচ্চিস্! তাতেই তো, এরা মাথায় চড়ে বসেছে। যে একটা মস্ত রাক্ষসকে টিকি ধোরে ঝড়ের ডগায় তুলে মেরেছে,—গিরি গোবর্দ্ধনটা যার একটা আঙ্গুলের উপর থেকে কত ঝড় বৃষ্টি তুফান সয়ে হেল্ল না, নড়্‌ল না—ব্রজের সবাই তা' দেখেছে; কালীনাগের মাথায় দাঁড়িয়ে যে বাঁশী বাজিয়েছে, তার মুখে এই কথা! দাদা-বলাই যার নাম ধরে শিঙ্গা বাজাচ্ছেন, আমরা দিন-রাত যাকে মাথায় কোরে রেখেছি, সে নাকি কেনা-গোলাম?

তুই ভাই, এদের বড্ড বাড়িয়ে তুলেছিস, এরা যা' তা' বল্‌ছে।"

এই বলে তারা মস্ত একটা হৈ চৈ কাণ্ড লাগিয়ে দিলে। কেউ পাচনবাড়ি তুলে সখীদের ভয় দেখাতে লাগল, কেউ "নাকে খৎ দে" বলে রঙ্গদেবীর পথ আগ্‌লে দাঁড়াল; কেউ চিত্রার দিকে চেয়ে চোখ রাঙ্গাতে লাগল। এতগুলো ছোঁড়া যদি এমন করে হেঁকে ওঠে, তবে ছুঁড়িরা কোথায় যায়? সখীরা পালাবার পথ খুঁজ্‌তে লাগল।

কৃষ্ণ বল্লেন, "এদের আর অপমান করো না, সত্যি বল্‌ছি আমার মনে বড্ড লেগেছে, আমি গোবর্দ্ধন ধরেছি ও তৃণাবর্ত্তকে মেরেছি সত্য, কিন্তু তোমরা জান না, আমি সমস্ত বল রাধার কাছ থেকে পেয়েছি, সে কি ভাবে যে পেয়েছি— তা আমি বল্‌তে পারবো না। বল্লেও বুঝবে না। রাইএর চোখের চাহনি পেলে আমার বুক বীরের

মত ফুলে উঠে, কংস-টংস আমার কাছে খড় কুটোর মত মনে হয়। যাক্ সে কথা, আজ আমার বৃন্দাবনের সাধনা বিফল হোয়ে গেছে—এদের যেতে দাও!"

২২

অনেকটা দেরী দেখে রাধার উৎকণ্ঠা বেড়ে গিয়েছিল। তিনি দেখ্‌তে পেলেন—সখীরা আস্‌ছে, যেন অনিচ্ছায় পা' ফেলে এগুচ্ছে। রাই সেখানে বসে থাকবেন না বিছানায় গিয়ে মুখ লুকিয়ে কাঁদবেন, এই ভাবছেন; এমন সময় চিত্রা এসে বল্লে, "রাই খবর ভাল নয়।"

"সে আমি আগেই জানি। কি দেখ্‌লে?"

তারা তিনজনে মিলে প্রথমে মুক্তোলতার ব্যাখ্যান কল্লে, তার পরে রাখালেরা যে সব দৌরাত্ম্য করেছে তা' বল্লে! কিন্তু সুদেবী বল্লে—

"কৃষ্ণকে তো ভাই, সে-রকম দেখ্লুম না! সে অনেকটা ভদ্র হোয়েছে, তার মুখে অনেক ভাল কথা শুন্লুম। রাখালেরা তো আমাদের অপমান না কোরে ছাড়ত না, কৃষ্ণই তো তাদের বারণ কল্লে। সে যে তোমায় দাসখৎ দিয়েছে তা স্বীকার কল্লে। আজ তার মুখে অনেক ভাল কথা শুনলুম।" এই শুনে রাই আঁচলে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগলেন, "হা কৃষ্ণ আমায় ছাড়্লে?" বিশাখার কোলে মাথা রেখে রাই কাঁদতে কাঁদতে অচেতনের মত হোয়ে পড়্লেন।

সুদেবী ঠিক্ বুঝতে পাল্লে না। সে আশ্চর্য্য হোয়ে বিশাখাকে বল্লে, "রাই একথা শুনে এত ব্যথা পেলেন কেন?"

বিশাখা বল্লে—"রাইএর সাথে কি কানুর ভদ্রতার সম্বন্ধ? সে সারাটা রাত রাধার চাঁদমুখ দেখেনি, তাতে সে একটিবার চোখের জল

ফেল্লে না, রাইকে নিষ্ঠুর বল্লে না, তোদের কাছে একটিবার রাইএর কথা জিজ্ঞাসা কল্লে না, আবার কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে, ভদ্রতা করে গেল, তোদের ভাল ভাল কথা শুনিয়ে গেল—তার মন কি রাধার উপর আর আছে রে, সুদেবী!"

২৩

রাত্রি আঁধিয়ারা। আজ কাঁটা বন, ভেঙ্গে জঙ্গলের পথে রাধা অভিসারে যাচ্ছেন। আজ যেমন কোরে হোক তাকে পেতেই হবে—তাকে না পেলে জীবনে কি দরকার? "একবার দেখ্‌ব, কিছু চাইব না, একবার পায়ে পড়ে শুধু প্রণাম করব। তাকে চোখের দেখা—সে যে আমার কি—তা' কে বুঝবে? আমি কিছু চাইব না, একবার চোখে চেয়ে দেখব, সেই দলিত কাজলের মত—নব মেঘের মত রূপ, সেই ময়ূরের পাখাটি,

যমুনার কালো জলের মত রূপ—দূর হতে দেখব—দূর হতে প্রণাম করব। বিশাখা তুই দেখাতে পারবি ? একদিনের দেখায় যে আমার কোটি-জন্মের তপস্যা সার্থক হয়। বিশাখা তুই দেখাতে পারবি ?”

বিশাখা বল্লে, “তা কি জানি ভাই ! সে যখন ধরা দেয়, তখন অতি সহজে ; পায়ে গড়াগড়ি যায়, কেনা-গোলাম হয়, দেখ্‌তে ছুটে আসে, শতবার বিরক্ত করে, কত-রকমে মনের ভালবাসা বোঝায়, পুকুরে নাইতে গেলে তোর ছোঁয়া জল ধরবার জন্যে পাগলের মত হাত বাড়ায়। কিন্তু যখন সে যায়—তখন কোথায় যায় কে জানে ! তখন কেঁদে কেঁদে রাত কাটালেও ত আসে না, পাঁচটা আগুনের মধ্যে গ্রীষ্মকালে তপস্যা কল্লেও তো তাকে পাওয়া যায় না। যে তোর মুখ দেখ্‌বার জন্যে ভ্রমরের মত আশে-পাশে বেড়ায়,

একটি দীর্ঘশ্বাস পড়লে কেঁদে আকুল হয়, সে যে কত নির্ম্মম হোতে পারে তা আর কি বল্‌বো? কেঁদে কেঁদে মরে গেলেও আর ফিরে তাকায় না। তাকে তোমায় দেখাব, তা' কি করে বল্‌তে পারি, রাই? তবে কুলশীল ছেড়ে এসেছ, রাজার মেয়ে মনে মনে কাঙ্গালিনী হোয়ে এসেছ, যাদের মধ্যে সে তোমায় রেখেছিল, তাদের মায়া কেটে আবার তারই কাছে ফিরে চলেছ,—মান-অপমান তুল্যজ্ঞান করেছ,—যে ঘর থেকে আঙ্গিনায় পা দিয়ে ভাবতো বিদেশে এসেছে, সে এই বন-পথকে বরণ করে নিয়েছে, যদি তাকে পাওয়ার পথ থাকে, তবে এই ত পথ, আর পথ ত জানি না।"

২৪

রাধা চল্লেন—সঙ্গে সঙ্গে সখীরা চল্লো। এই অন্ধকার রাতে তাঁদের গায়ের মণিমুক্তার

জ্যোতি পথ চিনিয়ে দিলে। যমুনার তীরে গিয়ে দেখেন সে মুক্তোবন নেই; আজ রাত্রে ত সে বেরিয়েছে, সঙ্গে কেবল সুবল সখা,—তবে কোথায় গেল ?

রাই বল্লেন—"এইত বংশীবট !" তখন সকল সখী থমকে দাঁড়ালেন। কই, কৃষ্ণ সেখানে নেই।

শ্যামকুণ্ডের ধারে গিয়ে রাধা বল্লেন, "এইখানে তার পায়ের চিহ্ন আছে, আমি আর কোথাও যাব না, এই চরণচিহ্নই যথেষ্ট। এর চেয়ে বেশী আর কিছু পাব না, তাকে পাব এমন ভাগ্যি কি করেছি ?" এই বলে সেই পদচিহ্নের উপর লুটিয়ে কাঁদতে লাগলেন। বিশাখাকে রাই বল্লেন—"যেত এমনই, তবে না হয় তার জন্যে কেঁদে কেঁদে আবার তপস্যা কর্ত্তুম, কিন্তু আমি তাকে একটা মুক্তোর জন্যে ছেড়েছি, এ জ্বালায় যে পুড়ে মলুম !"

* মুক্তা চুরি *

সেই আঁধারে শ্যামকুণ্ড, মদনকুঞ্জ, রাধাকুণ্ড দেখে হতাশ হোয়ে তাঁরা দ্বাদশ বন ও গিরি গোবর্দ্ধন খুঁজে বেড়ালেন, কৃষ্ণ কোথায়ও নেই। পা কাঁটায় ছিঁড়ে গেল,—গাছের ডালে ডুরে নীলাম্বরী আটকে গেল—সখীরা আর খুঁজতে পারেন না, রাধা এগিয়ে চল্লেন ;—তখন তাঁর খোঁপা খুলে গিয়ে একটি বেণী পিঠে দুল্‌ছে, গায়ের অলঙ্কার খুলে ফেলেছেন,—আর কে দেখবে ? মুক্তোর মালাটা ফেলে দিয়ে তুলসীর মালাটা রেখেছেন, নীলাম্বরী ছেড়ে গেরুয়া রঙের ওড়না পরেছেন ; গুঞ্জাফলের মালাটি—যা কৃষ্ণের নিজের দান—তা নিয়ে জপমালা করেছেন। একাকী সেই অন্ধকারে রাই চলে যাচ্ছেন—কোথায় কে জানে ? কৃষ্ণকে যারা খুঁজতে যায়, তারা কোথায় খোঁজে কে বল্‌বে ?—সে বনে, কি মনে, কে বলবে ?

২৫

কিছু দূর গিয়ে দেখলেন এক রাজপুরী, তার দরজায় দাঁড়িয়ে পরমাসুন্দরী এক স্ত্রীলোক, তার চুলের ভারে যেন মাথাটি নুয়ে পড়েছে, তার গায়ে হীরা-মণি দীপ্ত হোয়ে উঠেছে, সে সোনার ফুল-তোলা একখানি নীলাম্বরী পরে দাঁড়িয়ে আছে।

রাই গিয়ে তাকে বল্লেন—"ওগো, এই পথে কানুকে যেতে দেখেছ ?"

সেই রমণী অবাক্ হোয়ে তাঁকে বল্লে—"তুমি ব্রহ্মাণ্ডপতির কথা জিজ্ঞাসা কচ্ছ ? অমন অবজ্ঞার সঙ্গে নাম ধ'রে জিজ্ঞাসা কচ্ছ ? তুমি কোথাকার লোক ?—তোমার এত গরব !"

রাই গলবস্ত্র হোয়ে তাকে প্রণাম করে বল্লেন—"অপরাধ কোরেছি, ক্ষমা কর। কি জানি আমার

কেন মনে হয়েছিল, তিনি অতি আপনার জন—তাই ঐ রকম তুচ্ছ করে কথা কইবার অভ্যাসটা হোয়েছে। বল্‌তে পার, তিনি কোথায়?"

"তার কথা আমি কি বল্‌ব, আমি কি জানি? সাধু-সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা কর।"

রাধা সেখান থেকে গিয়ে দেখ্‌লেন, একটা মস্ত বড় যজ্ঞকুণ্ড ঘিরে সাধু-সন্ন্যাসীরা ব'সে আছেন। তাদের কারু কপালে ত্রিপুণ্ড্রক, কারু বাহুমূলে ত্রিশূল আঁকা, কারু মাথার জটা পায়ে লুটোচ্ছে, কারু মুখে ওঙ্কার ধ্বনিত হচ্ছে।

রাধা প্রণাম করে বল্লেন, "ব্রহ্মাণ্ডপতি কৃষ্ণের সন্ধান আমায় আপনারা কেউ বল্‌তে পারেন?"

তাদের একজন বল্লেন, "সৎকর্ম্ম কর, তারই মধ্যে তাঁকে পাবে।"

আর একজন বল্লেন, "বাসনা দূর কোরে কঠোর ব্রত কর—তাঁকে পাবে।"

তৃতীয় জন বল্লেন, "নিশ্বাস বন্ধ কোরে প্রাণায়াম শিখে যোগের আসনগুলি অভ্যাস কর, তাঁকে পাবে।"

আর একজন বল্লেন, "বাসনা দূর কর—তা হোলে জ্ঞান হবে—জ্ঞানের উদয় হোলে তাঁকে দেখ্‌তে পাবে।"

ষষ্ঠ সাধু বল্লেন, "হোমাগ্নি জ্বেলে অগ্নিকে পূজা কর; সেই অগ্নিই তাঁর তেজ প্রকাশ কোরে দেখাবে।"

এই সকল কথা শুনে রাধিকা তাদের প্রণাম কোরে সেখান থেকে চল্লেন—"এ সকলও নাকি মানুষে কর্ত্তে পারে? তিনি যে আমার একান্ত আপনার জন, তাঁকে প্রাণ সমর্পণ করে রেখেছি—এ দেহ তাঁকে দিয়েছি, এ দেহ জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে কি হবে? তাতে দুঃখই বা কি?"

২৬

তখন রাত্রি প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। রাধা একটি মাধবী গাছের নীচে বস্‌লেন,—আর কোথাও যাবেন না। একটা মাধবী ফুল তাঁর গায়ে পড়্‌লো, তিনি কৃষ্ণ-স্পর্শ ভেবে চম্‌কে উঠ্‌লেন। পূর্ব্বদিকে সিন্দূরের রঙ্গে আকাশের মেঘ মণ্ডিত হোয়ে উঠ্‌ল, রাধা সেই মেঘকে প্রণাম কল্লেন। শ্রান্ত দুঃখার্ত্ত রাধা মান-অপমান হারিয়ে—কেবল 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলে ডাক্‌ছেন। প্রভাতের পাখীরা যেন সেই নাম ধ'রে ডাক্‌ছে। কে যেন আসছেন! আনন্দে তার বেণী খুলে গেল, চুলের রাশি ফুলে উঠ্‌ল, গলার তুলসীর মালা দুলে উঠ্‌ল! আস্‌ছেন, সত্যি আস্‌ছেন—তাঁর মনে হ'ল কে যেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাকে অপলক চোখে দেখ্‌ছেন—তখন রাধা মনে মনে বল্লেন, "আমার কোন দেবালয় নেই,

এই দেহই আমার দেবালয়, এখানে তাঁর আবির্ভাব হবে—আজ এই দেহের বেদী আমার খোলা চুল দিয়ে ঝেঁটিয়ে সাফ্ কোরে সেখানে তাঁর আসন তৈরী ক'রে রাখব; এই গুঞ্জমালা দিয়ে বুকে আল্পনা দিয়ে রাখব,—আমার স্তনযুগ্ম তাঁর অভ্যর্থনার জন্য মঙ্গল ঘটস্বরূপ হবে।" তখন রাধার চোখ দিয়ে বিন্দু বিন্দু জল পড়তে লাগ্ল; প্রভাতী দোয়েল ও শ্যামা ডেকে গেল। কৃষ্ণ এলেন না। রাধা বৃষভানুপুরে গিয়ে শুয়ে প'ড়ে রইলেন। আজকের্ অভিসার এই ভাবে শেষ হোল।

২৭

পরদিন প্রত্যূষে ঘুম ভেঙ্গে উঠে সখীরা দেখেন একখানি হলুদ-রঙ্গের খাটো ওড়না পরে নিরাভরণা রাধা মেজোতে শুয়ে আছেন। বিশাখা

মালতীমালা দিয়ে যে বিনোদ খোঁপা বেঁধে দিয়েছিল—তা নেই, পিঠে একটা বেণী ঝুল্‌ছে; পায়ে নূপুর নেই, গলায় হার নেই, তুলসী-মালাটি শুকিয়ে আছে। ডান হাতখানি মাথা ছুঁয়ে আছে, তাতে গুঞ্জামালা ধরে আছেন। সর্ব্বাঙ্গে কাঁটার দাগ, চোখের কোণে অশ্রু শুকিয়ে আছে।

রাই স্বপ্ন দেখ্‌ছেন—সেই উষাকালে স্বপ্ন দেখেছেন। যেন শাঙন মাসের রাতে পালঙ্কে শুয়ে আছেন—ঘন ঘটা কোরে মেঘ এসেছে; রিমি-ঝিমি বৃষ্টি পড়ছে; সেই সুরের সঙ্গে বেঙগুলি যেন সঙ্গত কোরে গান করছে।—সম্মুখে গিরিগোবর্দ্ধন থেকে ময়ূরী কেকা রব কচ্ছে; যমুনার এক পারে ডাহুক ডাক্‌ছে, ও পারের মাধবী তলা থেকে আর একটা ডাহুক সাড়া দিচ্ছে—চারিদিকে যেন ঘুমন্ত পুরীর সুর খেল্‌ছে, রাধার কেশপাশ সারাটি পালঙ্ক জুড়ে ঢেউয়ের মত ছড়িয়ে

পড়েছে ; তাঁর গায়ের কাপড় একটু একটু বাতাসে নড়্ছে। বড় আরামে তিনি ঘুমুচ্ছেন। এমন সময় সে যেন এল ; এসে আস্তে-আস্তে নাকের নোলকটি ছুঁয়ে হাসতে লাগ্ল ; রাধার মনে প্রেমের বান ডাক্ল, তাঁর শরীর কৃষ্ণের গায়ে ঠেক্লো—তখন আনন্দে শরীর রোমাঞ্চিত হোতে লাগ্ল, কৃষ্ণ কথা কইলেন, সেই সুরে রাধার কাণ ভরে উঠল। কৃষ্ণ-অঙ্গের সুবাস—চন্দন অগুরুর চাইতেও মিষ্ট সেই সুবাসে ঘর ভ'রে গেল—তিনি কৃষ্ণকে স্পর্শ কোরে কথা কইবেন—কি জানি কত দুঃখ, যা অশ্রু হোয়ে চোখে উঠেছিল, পাষাণ হোয়ে বুকে চেপেছিল, তাই নিবেদন করবেন, এমন সময় স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল! চাতকী যেন মেঘের কাছে জল চাইতে গিয়েছিল, হঠাৎ বুকের উপর বাজ পড়্ল। অমনি ধড়ফড় করে উঠে দেখেন সুদেবী তাঁর দিকে চেয়ে আছেন—তার চোখ জলে ভরে

গেছে। রঙ্গদেবী আস্তে আস্তে তার গায়ে হাত বুলোতে লাগ্‌লেন। রাধা সজল চোখে কি যেন বল্‌তে গিয়ে বৃন্দার দিকে কেবল তাকিয়ে রইলেন। বৃন্দা বল্লে, "আমি যাচ্ছি, সকাল হোয়েছে, সে নিশ্চয়ই গোঠে এসেছে। তাকে কিছু শুনিয়ে দিয়ে আসি।" রাধা বল্লেন—"যদি দেখা পাস্—তবে বলিস্ যেন আমার অপরাধ ক্ষমা কোরে একবার চোখের দেখা দেয়, মন্দ কথা বলিস্‌ নে।"

২৮

কিন্তু বৃন্দার মনে রাগ হোয়েছিল। কৃষ্ণ যাতে নিজে এসে রাধার কাছে মুক্তো চান্, এই ফন্দী এঁটে তিনি সুদামকে ঠাট্টা করে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। সত্যি সত্যি কি কোনো গোপী কৃষ্ণকে ছেড়ে মণিমুক্তোর দিকে চায়? রাখাল কিনা, সে রাধার প্রেমের গূঢ় মর্ম্ম বুঝবে কি

কোরে ? মিছামিছি তাকে কষ্ট দিচ্ছে। একবার পেলে হয়! রাধার দুঃখ মনে করে তার চোখ দুটি ছলছল্ কচ্ছে,—এখন পেলে হয়!" কাল তো সন্ধ্যার পর বেরিয়ে পড়েছিল, তবু এত খুঁজে পাওয়া গেল না, গরুর রাখাল গোঠে না এসে উপায় কি! এইবার তাকে ধরবই ধরব!" এই ভাব্তে ভাব্তে হন্ হন্ করে দূতী চলেছেন। গোঠে রক্তমালতী, অপরাজিতা ও কৃষ্ণকেলী—দূরে দূরে ফুটে আছে। মস্ত বড় প্রান্তর। গাভীরা ঘাস খাচ্ছে, কিন্তু থেকে থেকে ঊর্দ্ধমুখে তাকাচ্ছে। কি যেন শুন্তে না পেরে উতলা হোচ্ছে। আজ কৃষ্ণের বাঁশী বাজ্ছে না, কিন্তু বলাই শিঙ্গা বাজিয়ে তাদের থামিয়ে রাখ্ছেন। বৃন্দা ব্যাকুল চোখে চারিদিকে তাকালেন; দেখ্লেন—শ্রীদাম সুদাম গাইগুলোর গায়ের মুক্তোর মালা নিয়ে নাড়া চাড়া কচ্ছে, তাদের নিজেদের গলায় ও মাথায়

* মুক্তা চুরি *

অজস্র মুক্তো, মুক্তোর মালার সঙ্গে গরু-বাঁধার দড়ি কাঁধে ঝুলছে। অদূরে মধু-মঙ্গল দাঁড়িয়ে বাঁশী বাজাচ্ছে। মুক্তোর উপর বৃন্দার ঘেন্না হোয়ে গেছে,—ছার মুক্তোর জন্যে এত দুঃখ! সে সেই মুক্তার সাজসজ্জা থেকে চোখ ফিরিয়ে বলরামের দিকে তাকালে। কিন্তু বলরাম আছেন—গোপীর নয়নাভিরাম কই? কৃষ্ণকে না দেখে বৃন্দার চোখ ছল্‌ছল্‌ করে উঠ্‌ল। অপমানের ভয়ে এদের কাছে ঘেঁস্‌তে সাহস হোল না, একবার মনে হল জিজ্ঞাসা করি, কিন্তু ভরসা কোরে রাখালদের কিছু বল্‌তে পারলে না।

দূতী কাতর দৃষ্টিতে চারিদিকে দেখ্‌তে লাগ্‌ল। কোথাও কৃষ্ণ নেই। গিরি গোবর্দ্ধনের ধারে ধারে কদমগাছের উপর হয় ত বাঁশী হাতে বসে আছে। রাধার সঙ্গে ঝগড়া হোলে তো সে প্রায়ই ঐখানে ধ্যান ধোরে বসে থাকে, তাই গাছের ডালে ডালে

বৃন্দার চক্ষু ফির্তে লাগ্‌ল, কোথাও না পেয়ে যেন তার মাথায় বাজ পড়লো। ভাণ্ডীর বন, যাবট্ কোথাও খুঁজতে বাকী রাখ্‌লে না। বৃন্দার গতি মন্থর হয়ে এল—পা যে আর চলে না। কৃষ্ণ কোথায় গেছেন ? তাঁকে ছেড়ে কি বৃন্দাবনে থাকা যায় ? তিনি কি বৃন্দাবন ছেড়ে চলে গেছেন ? বৃন্দা মাথায় হাত দিয়ে বোসে পড়্‌ল।

২৯

এদ্দিকে বেলা যতই বাড়্‌ছে—কৃষ্ণের মুখখানি না দেখে রাধার অস্থিরতা ততই বেড়ে উঠ্‌ছে। সখীরা এসে তাকে বোঝাতে লাগ্‌ল, কিন্তু রাধা চম্পকলতাকে ডেকে বল্লেন, "আমি তাঁকে পেয়েছি, তোদের কালো চুলে পেয়েছি, তোরা যে আমায় এত স্নেহ কচ্ছিস্ তার মধ্যে পেয়েছি, মা কৃত্তিকা কত আদর কোরে ডাকেন—সকল কথার মধ্যে

সকল উৎসবের মধ্যে—তাঁর বাঁশীটি বাজ্‌ছে, আমি শুন্‌তে পাচ্ছি,—ঐ যে তিনি আস্‌ছেন” এই বলে ছুটে গিয়ে মেঘের দিকে স্তব্ধ হোয়ে চেয়ে রইলেন; হাত জোড় কল্লেন; শেষে বল্লেন, “তোরা দেখ্‌ছিস্‌ কি, ঐ যে তিনি আস্‌ছেন!” তখন চোখ দুটিতে জল পড়্‌ছে; দৃষ্টি সংসার ছেড়ে কোন দেবলোকে গিয়ে পোঁছেছে। সঙ্গীরা ডাকছেন, কোন উত্তর নেই, রাধা যেন একখানি ছবির মত দাঁড়িয়ে রইলেন।

তারা ধরে এনে কত যত্ন কোরে তাকে শুইয়ে রাখ্‌লে। “আহা কি রূপ?” এক সখী বলছে, “কেমন পদ্মকলির মত পা দুখানি! যখন কৃষ্ণকে দেখবার জন্যে বনপথে ছুটে যান—তখন মনে হয় পথে বুক পেতে রাখি—যেন ঐ মাটি পায়ে না লাগ্‌তে পারে।” কেউ কেউ বল্‌ছে, “এই পায়ে তো কৃষ্ণ কত আল্‌তা পরিয়ে দিয়েছেন,

এখন তিনি এত নিষ্ঠুর হোলেন কেন?" কেউ রাধার মুখখানি দেখে বল্‌ছে, "কৃষ্ণের সঙ্গে দেখা হোলে হেসে-হেসে যখন কথা বল্‌তেন, তখন এই মুখ কেমন সুন্দর দেখাত!"

রাধার জ্ঞান হোলে তিনি যেন কার অপেক্ষায় পথের দিকে চেয়ে রইলেন। সুদেবী বল্লে, "বৃন্দা আসেনি।"

তখন রাধার চোখ গড়িয়ে জল পড়তে লাগ্‌ল।

৩০

এদিকে সখীরা চলে গেলে কৃষ্ণ রাখালদের সঙ্গে মুক্তো দিয়ে গরু সাজাবার উৎসবে যোগ দিলেন। তিনি প্রাণপণে ধৈর্য্য ধোরে সখীদের কাছে মনের ভাব সংবরণ করেছিলেন, ভদ্রভাবে কথা বলেছিলেন, কিন্তু মন ব্যাকুল হোয়ে উঠেছিল। কতবার চোখে জল এসেছিল এবং ভেবেছিলেন জিজ্ঞাসা করি, "রাধা কি দুঃখ কচ্ছেন? তার

মুখখানি কেমন দেখ্‌লে ?—কাঁদ-কাঁদ না হাসি-হাসি ?”

কিন্তু রাখালদের সাম্‌নে সে সকল প্রশ্ন কর্‌তে ভরসা হোল না।

রাত্রে কুঞ্জে যাবেন বলে বাঁশীটি হাতে করে বেরিয়ে পড়্‌লেন, কিন্তু সখীরা টিট্‌কারী দেবে ভেবে অনেকক্ষণ ধোরে কদমগাছে বসে পা দোলাতে লাগ্‌লেন। একবার নেবে পা-টিপে-টিপে কুঞ্জের দুয়ারে গিয়ে কাণ পেতে রইলেন; তখন রাধা সখীদের নিয়ে তাকে খুঁজ্‌তে বেরিয়ে পড়েছেন—সুতরাং কুঞ্জটি নীরব। মনে রাগ হোল ;—একটা মুক্তোর জন্য এত অপমান কোরেও তার আশ মেটে নি, শেষে কুঞ্জেও এল না! তখন আর সেখানে না থেকে বাড়ী গিয়ে মা-যশোদার কোলের কাছে ঘুমিয়ে রইলেন।

পরদিন যখন গোঠে নিয়ে যাবার জন্য সব

ছেলেরা এসেছে তখন তিনি মায়ের আচল ধোরে দাঁড়িয়ে রইলেন, সখাদের বল্লেন—"আজ আমি যাব না।" সুবল কারণ বুঝে মনে-মনে হাস্‌লে, কিন্তু আর-আর সখারা হতাশ হোল। একে তো মা-যশোদার কাছ থেকে কত কাকুতি-মিনতি কোরে কৃষ্ণকে নিয়ে যাওয়া, তা' যখন সে নিজেই বেঁকে বসেছে তখন মা-যশোদা তো কিছুতেই ছাড়্‌বেন না। বলাই শুধু শিঙ্গাটা ডান হাতে ধোরে একবার কানুর কাণে-কাণে বল্লে, "গরুরা যে তোর বাঁশী না শুনে পথে এগতে চায় না,—তার কি করব্‌ বল ?" "দাদা, শিঙ্গা বাজিয়ে চালিয়ে নিও।"—বলাই দা চলে গেল ; সঙ্গে-সঙ্গে সখারা বারবার ফিরে-ফিরে কানুকে দেখ্‌তে-দেখ্‌তে চলে গেল।

যশোদা যেন হাতে স্বর্গ পেলেন।

কানু বাঁশীটি হাতে করে ঘুরে বেড়াতে লাগ্‌লেন। "তাকে ছাড়া ত থাক্‌তে পারবো না,

তার জন্য বাঁশী, তার জন্য গরু চরান, তার জন্য এই বৃন্দাবনের ফাঁদ পেতেছি, ময়ুর-পাখা দিয়ে তার গায়ে বাতাস করব বলে মাথায় রেখেছি, তাকে যদি না পেলুম—তবে পৃথিবী মিথ্যে। তাকে দুঃখ দিয়ে, তার কুলশীল ভেঙ্গে তার দর্প চূর্ণ করে বেণী ধরে টেনে আমার কাছে আন্‌ব এই তো আমার পণ। সে যদি না এল তবে ফুল ফুটলে, পাখী গান কল্লে—নানা রংএ বন উদ্যান সাজলে কি হবে? এ সকল তো তারই মন-হরণের জন্য, সে যদি ধরা না দেয়, তবে সমস্ত আয়োজন মিথ্যে, এ কুঞ্জ সাজিয়ে রাখলুম কেন?"

কৃষ্ণ কত কি ভাবছেন—"এখন কি করা যায়? দিন-দুপুরে যাওয়া যায় কেমন কোরে? তার মুখখানি যেমন কোরে হোক দেখ্‌তেই হবে, কিন্তু বৃষভানু পুরীতে দিন-দুপুরে কি করে ঢুকবো। রাই কি আর কুঞ্জে আসবে? আমায় সে ছেড়ে

দিয়েছে ! সুবল সখাকে ডেকে পরামর্শ করি, সেই ত যমুনা-স্নানের বুদ্ধিটা দিয়ে রাধাকে ঘরের বাইরে এনেছিল, তাই প্রথম দেখা হোয়েছিল। কিন্তু সুবল-সখা তো গোঠে গেছে, সখাদের একবার ফিরিয়ে দিয়ে এখন আবার কি করে সেখানে যাওয়া যায় ?”

এই সকল ভাব্‌তে ভাব্‌তে কৃষ্ণ নন্দালয়ের ধারে একটা উঁচু জায়গায় বাঁশীটি হাতে কোরে বসে রইলেন—মুখে রাধা নাম বল্‌ছেন, আর মনের ব্যথা মনে বেড়েই চলছে—মাটির ঢিপিতে লেগে সর্ব্বাঙ্গ ধূলোয় ধূলোময় হয়ে গেছে—চূড়োটা খ'সে পড়েছে—শেষে বাঁশীটাও হাত থেকে খসে গেল।

৩১

তখন দূর হোতে দেখ্‌লেন, কে ধীরে ধীরে আস্‌ছে ; তার চোখ দুটি জলে ছল্‌ছল্ কচ্ছে।

"এতো বৃন্দা!—নিশ্চয়ই আমায় খুঁজতে বেরিয়েছে! রাধা কি আমায় না দেখে থাকতে পারে?" এই ভেবে তাড়াতাড়ি গায়ের ধুলো ঝেড়ে, আল্গা পীতধড়াটা কোমরে কসে বেঁধে, চূড়োটা তুলে নিয়ে—পালকগুলো সাজিয়ে মাথায় পরে, বাঁশীটি হাতে নিয়ে সেজে-গুজে ঠিক হয়ে বস্লেন। দূতী এসে সাধাসাধি কল্লে, দুকথা শুনিয়ে তবে তার সঙ্গে যাবেন মনে-মনে এইটে স্থির করে রাখলেন।

দূতী তাঁর উপরে এক-কাটি! সে আড়-চোখে সমস্ত ব্যাপার দেখে কৃষ্ণের ভাবগতিক বুঝে নিয়েছিল—সে ওধার দিয়েই গেল না। যেন কানুকে দেখে নি এই ভাব কোরে সে অন্য ধার দিয়ে যেতে লাগল। কৃষ্ণ অবাক হোয়ে দেখলেন বৃন্দা তাকে ছেড়ে চলে গেল; তখন খানিকটা চুপ করে থেকে "—দূতী গো!" বলে হাঁকলেন। দূতী আপনার মনে চলে যেতে লাগ্ল—যেন

শুনতেই পায় নি। তখন কৃষ্ণ ছুটে গিয়ে পিছন থেকে খুব উচ্চৈঃস্বরে ডাকতে লাগলেন। বৃন্দা পিছন ফিরে জিজ্ঞাসা কল্লে—“ও-রকম শ্যামলী-ধবলীর সুর নকল করে চেঁচিয়ে ডাকছ কেন? তুমি পুরুষ মানুষ! রাস্তায় এমন করে ডাকলে আমাদের লজ্জা হয় না!” কৃষ্ণ চুপ করে রইলেন। বৃন্দা বল্লে, “কেন ডাকছিলে?” কৃষ্ণ কথা বলতে পাল্লেন না, চোখ থেকে টপ্ টপ্ করে জল পড়তে লাগল। তখন বৃন্দা ব্যাপার বুঝে তাকে পেয়ে বসলো। সে বল্লে—“কাঁদছ কেন? ননী চুরি করে যশোদার হাতে মার খেয়েছ বুঝি?” কৃষ্ণ চোখের জল ডান হাত দিয়ে মুছে ফেলে বল্লেন, “দূতী, তোমরাও আমায় ছাড়লে!”

৩২

অনেকক্ষণ ধোরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দুই জনের কথাবার্ত্তা হোল, কৃষ্ণ মাঝে মাঝে দীর্ঘনিশ্বাস ফেল্‌ছেন, দুচোখ দিয়ে জল ঝর্‌ছে, আর বল্‌ছেন—"তবে কি সে আমার মুখ দেখ্‌বে না বৃন্দা? সে আমায় না দেখে থাক্‌বে কি করে? সে তা পার্ব্বে না,—কখ্‌খনই নয়। আর আমিই কি পারি?"

বৃন্দা—"আমি কি বল্‌ছি সে তোমায় ছাড়া থাক্‌তে পারে? কিন্তু এখন ভাই, তার তো রাগ পড়ে নি। তোমরা সবাই মিলে তার সখীদের যাচ্ছেতাই বোলে অপমান কোরে দিয়েছ, এখন কয়েকটা দিন না গেলে সে কোন্ মুখে আবার তোমার সাম্‌নে বেরুবে?"

কৃষ্ণ বল্লেন—"সুদামকে সকলে মিলে তোমরা কি-রকম অপমানটা করেছ,—সে কথা ত একটিবার

তুল্লে না! আমাকেই কি তোমরা ঠাট্টা-বিদ্রূপ কর্ত্তে কম করেছ?"

"সে তো তোমায় পাবার জন্য। তুমি ডান হাতের বাঁশীটা বাঁ হাতে রেখে, তার কাছে হাত পেতে মুক্তো নেবে, তাতে রাই কত সুখী হোতো! তুমি রাখাল এটুকু বুঝলে না? হাজার হো'ক স্ত্রীলোকের মান—তা তোমাদের রাখ্‌তে হয়!"

কৃষ্ণ চুপ করে রইলেন। বৃন্দা বল্লে—"তবে আমি এখন যাই। তুমি দিন কয়েক পরে চেষ্টা করে দে'খ। এখন আমার ভারি কাজের তাড়া, রাই আজ ব্রাহ্মণ ভোজন করাচ্ছেন।"

"কেন, ব্রাহ্মণ ভোজন কেন?"

"লোকে কত গঞ্জনা, কত কলঙ্ক দিচ্ছে,—একটা প্রায়শ্চিত্ত তো চাই?"

"মিথ্যে কথা! আমায় ভালবেসে সে প্রায়শ্চিত্ত করবে? তা হোতেই পারে না!"

বৃন্দা হেসে বল্লে—"তা যা' বল ভাই, এখন ছেড়ে দাও।"

"আমায় নিয়ে যাও বৃন্দে, দুটি পায়ে পড়ি।"

৩৩

শেষে অনেক কথা-কাটা-কাটি ক'রে বৃন্দা কৃষ্ণকে কুঞ্জের নিকট নিয়ে এসে রাধাকে আগেই এসে বল্লে, "তুই ভাই কুঞ্জে মান করে বসে থাক্‌গে।"

রাধা বল্লেন, "কিসের মান? কার উপর মান? আমার চাইতে শতগুণে সুন্দরী, আমার চাইতে ঢের বড় রাজার মেয়ে বলেছে যে ব্রহ্মাণ্ডপতিকে আমি অবজ্ঞা কোরে কথা কয়েছি। তিনি যোগীর আরাধ্য। দয়া করে কুঞ্জে এসেছেন—সে কেবলই তাঁর দয়া, আমার কোন গুণ নেই, আমি এমন কি ভাগ্য করে এসেছি, যে তাঁর সেবা করব! আবার মান?"

বৃন্দা বল্লে, "রাধা, তুমি বৃন্দাবনের গৌরব মাটি করতে বসেছ! তুমি কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য দেখে ভয় পেয়েছ? আর তো কুঞ্জে তুমি শোভা পাবে না।"

রাধা চক্ষের জল ফেল্‌তে ফেল্‌তে কুঞ্জে ঢুকে বল্লেন, "আমি আবার মানের পালা অভিনয় করব কি করে?"

বৃন্দা বল্লে—"সে আপ্‌নি হবে।"

তখন রাধা রাধা বলে বাঁশী বেজে উঠ্‌ল, কৃষ্ণ কুঞ্জদ্বারে এসে উপস্থিত হোলেন। রাধা অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন, দুটি চক্ষে জল পড়্‌তে লাগ্‌ল এবং বৃন্দাকে বল্লেন, "এতো কৃষ্ণকে দেখ্‌ছি, না একি নব মেঘ? একি বিদ্যুতের ছটা, না পীতবাস দেখ্‌ছি? একি বকের দল দূর নীল মেঘের গায় চলে যাচ্ছে, না মুক্তোর মালা কৃষ্ণের গায়ে দুল্‌ছে? একবার মেঘ দেখে ভুল করে অজ্ঞান হোয়ে পড়েছিলুম, একি আবার তেমনই ভুল হোল?

ও কে দাঁড়িয়ে ? ওকি কুটজ ফুলের ঘ্রাণ আস্‌ছে, না কৃষ্ণ-অঙ্গের সুরভি ?”

রাধা বৃন্দার কাঁধে মাথা রেখে কাঁদতে লাগলেন। বৃন্দা বল্লেন—“সে হবে না, ও কৃষ্ণই এসেছেন, তোমার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছেন। তোমাকে মান করে বসে থাক্‌তেই হবে—না হোলে আমাদের মান থাকে না।”

৩৪

রাধাকে জোর করে টেনে বৃন্দা একটা পুষ্পা-বেদীর উপর বসিয়ে কৃষ্ণকে নিয়ে এল। রাধা নিজেকে সংবরণ করতে গিয়ে এলিয়ে পড়্‌লেন। সেই সময়ে কৃষ্ণ এসে তার পা দুখানি ধোরে সেখানে বসে পড়্‌লেন, ফোঁটা ফোঁটা চোখের জল সেই কোমল পায়ের উপর পড়্‌তে লাগ্‌ল।

কৃষ্ণ-স্পর্শে রাধার যে মান ছিল না, তা জেগে

উঠল। সত্যই সেই আত্ম-সমর্পণের ইচ্ছা, কানুর পা নিজে জড়িয়ে ধোরে তার ধূলি মাথায় নেবার ইচ্ছা—তার চলে গেল। গর্ব্বের আভায় তার মুখ রেঙ্গে উঠ্‌ল, তার চোখেরজল শুকিয়ে গিয়ে বেশ দিব্য বাঁকা চাউনি ফুটে উঠল। তার মুখখানি ভার হোল।

কৃষ্ণ তার সাধ্‌বার পালা সুরু করে দিলেন কিন্তু কিছুতেই রাধা মুখ উঁচু কল্লেন না। তার পায়ের উপর কৃষ্ণের কোমল হাত রয়েছে, সেই সুখে তার চোখ বুজে এসেছে, গর্ব্বে বুক ভরে গেছে, আর মান ভাঙ্গায় কার সাধ্যি! সে মান তখন কঠিন হিমগিরির মত কৃষ্ণের কাছে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে উঠল। এ পাহাড় গলায় কার সাধ্য?

কৃষ্ণ কত কি বল্লেন, যে সকল কথা আহার-নিদ্রা ছেড়ে রাধা চিরদিন শুন্‌লেও কর্ণের তৃপ্তি হয়

না! এ কি শিবের ডমরু বাজ্‌ছে, না নারদের বীণা বাজ্‌ছে? কৃষ্ণ যে তাকে কত ভালবাসেন, সেই কথা বিনিয়ে-বিনিয়ে চোখের জল ফেল্‌তে-ফেল্‌তে তিনি বলে যাচ্ছেন। এদিকে তার স্পর্শ-আবেশে মনপ্রাণ ভরে গিয়েছে। এই পর্ব্বত-প্রমাণ গৌরবের সৃষ্টি করে কানু রাধার মান ভাঙ্গবেন কেমন কোরে? মানের ইন্ধন তো তিনিই জোগাচ্ছেন। যেদিন যমুনার তীরে সন্ধ্যায় কালো রূপ নিয়ে তাঁকে দেখা দিয়েছিলেন, সেই অবধি কত সঙ্কেত, কত ইসারা, কত ছলে, তাঁকে ডেকেছেন; কত তপস্যা করে তাঁর দেখা পেয়েছেন, পায়ের নূপুর ছুঁতে পেয়েছেন—সেই সকল কথা বল্‌তে লাগ্‌লেন—রাধার কাণে সেই সুর বাজ্‌ছে; যেন হোমাগ্নির সম্মুখে বসে ঋষি ঋক্‌মন্ত্র পাঠ কচ্চেন। রাধার জ্ঞান নেই, রাধা কি কোরে হাত তুলে কৃষ্ণের চোখ মোছাবেন? সে অবসর কোথায়? কি কোরে কথা

কইবেন ? জিহ্বার কথা বলবার শক্তি কোথায় ? কি কোরে চোখ খুলে দৃষ্টি সুধা বিতরণ করবেন ? মনের মধ্যে যে কৃষ্ণের ছবি স্থির হয়ে আছে, বাইরে চাইতে গেলে সে ছবি যে মুছে যায়।

কৃষ্ণ কি বল্লেন রাধা বুঝলেন না, শুনলেন না, কেবল মন বল্লে 'বড় মধুর !' 'বড় মধুর !' চোখ কাণ—দশ ইন্দ্রিয় ডুবে রইল, কেবল জেগে রইল আনন্দ। কৃষ্ণ নিজেই মান ভাঙ্গবার পথ আগ্‌লে রইলেন।

৩৫

তখন বৃন্দা দেখলে—এর শেষ নেই। কৃষ্ণের পীতধড়াটা টেনে ধরে তাঁকে বাইরে নিয়ে এল। কাঁদতে কাঁদতে কৃষ্ণ বল্লেন—"আমার উপর দয়া কি হবে না ?" তখন একবার এগিয়ে যান, আর একবার হটে আসেন,—সেই পা দুখানির

দিকে দৃষ্টি রেখে; চল্‌তে আর মন সরে না। এদিকে কৃষ্ণের স্পর্শ চলে গেছে। হঠাৎ নৌকা ডুবি হোলে যেমন লোকে অকুলে পড়ে, রাই তেমনি ধড়্‌ফড়্‌ করে উঠ্‌লেন—কই কাণের অলঙ্কার কই? কৃষ্ণ যে কথা বলে অমূল্য অলঙ্কারের সৃষ্টি কচ্ছিলেন,—তা কে হরণ করে নিলে? অমূল্য স্পর্শের সোণার-আঁচল সাড়ী দিয়ে যে কৃষ্ণ তাকে ঘিরে রেখেছিলেন, এখন যে তিনি অতি দরিদ্রা নগ্না হোয়ে পড়্‌লেন। রাধা উঠে দেখেন, কৃষ্ণের মুখ তাঁর দিকে, কিন্তু পা উল্টো দিকে; সেই সজল চোখের দৃষ্টিতে তাঁর চোখে বাণ ডেকে এল। তিনি কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে কৃষ্ণের পায়ে লুটিয়ে পড়্‌লেন এবং বেণী দিয়ে তা একেবারে বেঁধে ফেল্লেন। কৃষ্ণ যত্ন করে তাকে উঠিয়ে বল্লেন, "মুক্তো-বন করেছিলুম রাই, চোখের জল মুছ্‌তে মুছ্‌তে মুক্তো দিয়ে সবাইকে সাজিয়েছি, সাজাতে

পারি নি তোমায়। এই দেখ পীতবাসে বেঁধে সে মুক্তোছড়া এনেছি, তুমি নূপুর ক'রে পায়ে পর।"

রাই বল্লেন, "আমার মুক্তোর হার-ছড়া আমি ফেলে দিয়েছি, এই শুক্‌নো তুলসীর মালাটা আমার বুকে আছে, তাই দিয়ে বুকের জ্বালা জুড়িয়েছিলুম।"

৩৬

তখন একখানি কোমল চাঁপার কলির মত মুঠি থেকে কতকগুলি ফাগ ছড়িয়ে কে সুকণ্ঠে হেসে উঠ্‌ল—কার নাগেশ্বর-নিন্দিত দুটি আঙুল একটি সুন্দর ফুলের মালা আকাশে উড়িয়ে দিয়ে আবার জোড়-হাত হয়ে প্রণাম জানালে—কার কণ্ঠে কোকিলের রবে হুলুধ্বনি হোতে লাগ্‌ল—কাদের হাসির কলধ্বনি সেই লতামণ্ডপটি মুখরিত কল্লে—কাদের ভ্রমরের মত কালো চোখের চাহনি লতা-বিতান হোতে কৌতুকের সঙ্গে সেই মিলন দেখ্‌তে

লাগ্‌ল—তা দেখ্‌বার আমাদের অবসর কোথায় ? তখন সেই রাত্রির উৎসব আকাশের ঘাটে ঘাটে তারা হোয়ে জ্বলে উঠল। চাঁদ এখন একটি কেন শতটি হোয়ে উদিত হও, ফুলবাণ পাঁচটি কেন শত শত হোয়ে কুঞ্জে এসে পড়,—মলয় সমীরণ ব্যজনী হাতে নিয়ে এসে বাতাস কর—তোমাদের ভয়ে কুঞ্জের দ্বার আর কেউ বন্ধ করবে না। আমরা এখানে মিলনের উপর পটক্ষেপ কচ্ছি।